পাকিস্তানের পত্র

শ্রীনীহাররঞ্জন ঘোষাল

দি ফিনিক্স্ প্রেস লিমিটেড্
কলিকাতা : ১

উৎসর্গ

পাকিস্তানের হিন্দু

ও

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের

উদ্দেশ্যে-

কলিকাতা

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫

পাকিস্থানের পত্র

সুচরিত—

স্বাধীনতার লাল সূর্য্য আমরা সুরাজপুর থেকেও দেখতে পেলাম। পনেরোই আগষ্ট খণ্ডিত ভারতের উভয় অংশেই এনেছে আলোড়ন, এনেছে আশা, জাতির জীবনে নিয়ে এল ভবিষ্যতের নূতন কর্ম-প্রবাহ। যাঁরা ইংরেজ বিতাড়নে জীবন-ব্যাপী সংগ্রাম করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ সুরাজপুরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। আজকে তাঁ'রা এখানে উপস্থিত নেই। দেশের ইতিহাসে যাঁ'রা অমরতা দাবি করতে পারতেন তাঁ'রা সব আমাদের কাছে কেউ আর বেঁচে নেই। পনেরোই আগষ্টের পূর্ব্বে তাঁ'রা সুরাজপুর ত্যাগ ক'রে গেছেন। সুরাজপুরের পুরনো সংসার সম্ভবতঃ গ'ড়ে উঠছে কলকাতার জনারণ্যে। দিল্লীর লাল কেল্লায় জাতীয়-পতাকা উত্তোলনের চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা, আমাদের নৈরাশ্য-কাতর মানসিক বিপর্য্যয়ের

কাছে নিতান্তই হাস্যকর। তরঙ্গ-বাহিত হ'য়ে যে স্বাধীনতা বিলেতের উপকূল থেকে ভারতবর্ষের তটে এসে উদ্যোগ ও উদ্দীপনার কল্লোল সৃষ্টি করেছে, আমরা তা'র সমারোহ-সভায় উপস্থিত নেই। আমাদের উপস্থিতি খণ্ডিত ভারতের বৃহত্তর অংশে আজ আর অপরিহার্য্য নয়। ইংরেজ-বিতাড়নের সংগ্রাম পর্ব্বের প্রথম ও শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসির মঞ্চে আমাদের সংখ্যাধিক্যে অনেকেই বিস্ময়-বোধ করেছেন বটে—কিন্তু সে তো পশ্চাতের পদধ্বনি, রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদের পর, কেউ আর শুনতে পাচ্ছেন না। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত তোমরা যখন জীবনের জয়গান গাইছ, আমরা তখন সুরাজপুরে ব'সে মোহমুদ্গর আবৃত্তি করছি, 'কা তব কান্তা' ইত্যাদি !

বিত্তশালীদের কান্তা ও কুন্তীর দল এ রাজ্য ত্যাগ করেছে বড়লাটের স্বাধীনতা-ঘোষণার পূর্ব্বেই। যা'রা রয়ে গেল, তাদের ভবিষ্যৎ বিড়ম্বনার কথা ভেবেই আমরা 'মোহমুদ্গরের' মুগুর ভাঁজতে বাধ্য হচ্ছি। দস্যুর আক্রমণ যদি দস্যুর দ্বারাই প্রতিহত না হয়, তবে আশা করছি উক্ত শ্লোকের শাস্ত্রীয় ব্যাখার দ্বারা কান্তা পালনের ও রক্ষণের যৌক্তিকতা খণ্ডন করব। খণ্ডন-কার্য্যে যদি সক্ষম না হই, তবে কান্তার দল স্বাভাবিক নিয়মেই বিরুদ্ধ পক্ষের শিবিরের দিকে যখন রওনা হ'য়ে যা'বে, আমরা তখন পরলোকের ইতিকথার পালঙ্কে শুয়ে ঈশ্বরের

আদেশে আরও কতকগুলো শ্লোক লিখে ফেলব। মেরুদণ্ডে ঘুণ্ ধরলেও শ্লোক রচনার মরণ কামড় দিতে ছাড়বো কেন? মরণ কামড়ই বা দিতে পারছি কই। দন্তস্ফুট করবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অনুভব করছি যে বিজাতীয় পাইওরিয়া রোগে দন্তরাজির ভবিষ্যৎ ঝর্ঝরে হ'য়ে গেছে। হাঁ করলেই যেন সবগুলো দাঁত গড়িয়ে ঝ'রে পড়বে মাটিতে। পড়ছেও তাই।

একে একে সব এ'দেশ ত্যাগ করতে লাগল। বিত্তশালীর পর, মধ্যবিত্তেরা ঘটি-বাটি আর টিনের স্যুট্‌কেস্ সাজিয়ে চল্লো সব হিন্দুস্থানের দিকে। হিন্দুস্থান বলতে আমরা খণ্ডিত ভারতবর্ষের কথাই বুঝি। পাকিস্থান সৃষ্টির পর সবাই যেন সরকারের আদেশে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বলতে আরম্ভ করেছে। সরকারের আদেশ না-পেলেও, জন-সাধারণ ইতিহাসের আদেশ পেয়েছে। পাকিস্থানে মুসলমান থাকবে আর হিন্দুস্থানে হিন্দু থাকবে, সে'কথা বুঝবার জন্য দরকার কি আমাদের বিলেত থেকে একটা রাজকীয়-কমিশন্ আমন্ত্রণ করবার? তোমরা জনসাধারণকে যতটা অজ্ঞ মনে করো, ততটা অজ্ঞ ওরা সত্যিই নয়। ওরা জানে, পাকিস্থান মুসলমানের রাজ্য হলেও সেখানে কিছু হিন্দু সব সময়েই থাকবে। এবং এই কথাটা বোঝাবার জন্য দিন-রাত্তির পাকিস্থান বেতার-কেন্দ্র থেকে উচ্চ-পদীয় নেতাদের ঘোষণা

প্রচারের আয়োজন নেই। শুধু জীবন বাঁচাবার প্রশ্নই যদি হয় তবে আমরা শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থানে টিকবই।

কিন্তু আজ থেকেই মধ্যবিত্তের দল তীর্থযাত্রীর মতো সব বেরিয়ে পড়েছে পথে। আমি জানি, তোমরা ওদের আমন্ত্রণ করো নি। ওদের জন্য কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা যে এখনো হয় ওঠে নি, সে'কথা ওরা জানে না বটে, কিন্তু আমি জানি। তোমরা কাগজের মারফৎ খবর দিচ্ছ (হয় তো আশ্বাসও) যে আমাদের কেউ যেন বাসস্থান ত্যাগ না করে। এবং তোমরাই আবার লোক মারফং গুজব বিতরণ করছ এই বলে যে পাকিস্থানে হিন্দুজীবন নিরাপদ নয়। তোমরা সম্ভব ইজ্জতের চাইতে জীবনটাকেই বড় মনে করো। আর জীবন যদি আমাদের নিরাপদ না-ই হয়, তবে তোমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করবে কি করে? ইংরেজের দয়ায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'য়েছে ব'লে কি তোমরা সব মনে করছ যে একটা মহা-যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতা তোমাদের আছে? তার আগে তোমাদের অংশে যে-সব ম্যালেরিয়াবাহী মশক বাহিনী আছে সেগুনোর বিরুদ্ধে কামান-দাগা অভ্যাস করো—তারপর যদি পার, মৃত্যুবাহী কুসংস্কারগুলোকে পয়েণ্ট-ব্লাঙ্ক নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে এনে মেসিন-গান্ চালিয়ে দাও। তা'তেও যদি ব্যর্থতা আসে, তবে আমেরিকার কাছ থেকে একটা ক্ষুদে আনবিক বোমা ভিক্ষে করে

নিয়ে এসে টুপ ক'রে ফেলে দাও ঐ মৃত্যু-বাহী বীজাণুগুলোর উপরে। প্রথমটায় কষ্ট হ'বে, খুবই কষ্ট হবে জানি। সহস্র বৎসরের দুধ-কলায় লালিত সমাজ নাগিণীর স্ফীতি নিয়ে যতই কেন গর্ব্ব কর না, আমার আর জানতে বাকি নেই যে যা'রা মহাকালের দরবারে আজ ভীড় জমিয়েছে তা'দের অনেকেই নাগিণীর দংশন থেকে নিস্কৃতি পায় নি। লালনেই যে মারাত্মক বীজাণুর বৃদ্ধি হয়, তেমন একটা সোজা বৈজ্ঞানিক সত্য, তোমাদের অংশের ক'জনই বা জানে বলো!

তবুও ওরা চল্লো। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি পদক্ষেপে ওদের জড়তা আসছে---ভাগ্যের চক্রান্তে আর তোমাদের ষড়যন্ত্রের মূল্যবান অস্ত্ররূপে, ওদের ব্যবহার করবার জন্য, তোমরা চাইলে ওরা দেশত্যাগী হোক্। অপরের হাতের অস্ত্র বলেই, ওরা দেশ ও দশের এমন কি নিজেদেরও কল্যাণের পথ ত্যাগ করে' তোমাদের নির্য্যাতনের বৃক্ষ-ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। তোমরা বলবে বৃক্ষ নয়, রিফিউজি ক্যাম্প। ক্যাম্প-পরিচালনায় তোমাদের কৃতিত্ব বিশ্বব্যাপী। ঈশ্বরের দয়ায় এ'যাবত-কাল দুর্ভিক্ষে ও প্লাবণে বাঙ্গালীর জীবনে দুর্যোগ নিয়মিতভাবেই আসছিল—আর তোমরাও নিয়মিতভাবে চাঁদার খাতা ছাপিয়ে মাড়োয়ারী-বধ যত না করতে পেরেছ, তা'র চাইতে বেশী চাঁদা আদায় করেছ দুস্থের

পকেট থেকে আর্ত্তের সেবার জন্য। সেবাধর্মের রস তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় ব'লে এদের টেনে নিয়ে যাচ্ছ রিফিউজি ক্যাম্পে। তোমাদের লোভেরও সীমা নেই—স্বাধীন ভারতের কামধেনুর বাঁটে মুখ ঠেকিয়ে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর জন্য দুধ সংগ্রহে ছুটে বেড়াচ্ছে 'বুইক' গাড়ীতে চেপে। 'বুইক'-গাড়ীর চাপায় পড়ে কত না শিশু থেংলে গিয়ে ক্ষুদ্রাকার মাংসের কিমায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, তবু তোমাদের আর্ত্তের জন্য ক্যাম্প খুলতেই হয়। আর্ত্তের ভাগ্য ভাল যে ওরা মরে আর তোমরা সব বাঁচো।······

পাকিস্থান-পত্রের ভূমিকায় ওরা অন্তর্হিত হয়ে গেল। অনুরোধ করেছিলুম ফিরে আসবার জন্য। বুঝিয়েছিলুম যে দল-বেঁধে থাকব—আঘাতের প্রবলতা ক্ষীণ হ'য়ে আসবে দলের কেন্দ্রীভূত প্রতিরোধ ক্ষমতায়। আবেদন করেছিলুম যে গৃহ হীনতার অনিশ্চতায় মরণের চাইতে গৃহ রক্ষার সাহসিকতায় মরণ অনেক গৌরবের। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। যে-গৃহে মৃত্যুর নিশ্চয়তায় কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, সেখানে কেমন করেই বা থাকবে ওরা? মরণে ভবিষ্যৎ গৌরব থাকলেও উপস্থিত জীবনের মূল্য অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে গৃহ-রক্ষার মরণ-কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়—সুতরাং ওরা চল্লো।

দাশুর ছেলের অন্নপ্রাশন হলো না, বিজয় পণ্ডিতের মধ্যম পুত্রের উপনয়ন বন্ধ রইল। দু'চারদিনের মধ্যেই

রমেন সেনের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের দিন স্থির হ'য়েছিল, তিনিও অস্থির হ'য়ে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে শেষ পর্য্যন্ত রওনা হ'য়ে গেলেন। সুদখোর অবিনাশ বাড়ুজ্জে ক'দিন থেকে দেওয়ানী আদালতে যাওয়া-আসা বন্ধ করেছে। এরই মধ্যে প্রায় ছ' সাতটা তারিখ পড়েছিল, সে পরম তাচ্ছিল্যে আদালতে উপস্থিত হয় নি। অনাদায়ী সুদ ও আসলের একটা মোটামুটি অঙ্ক পর্য্যন্তও সে আর স্মরণ করতে পারেনা নাকি।

প্রায় তু'শ বছরের কারবারের প্রদীপটা যেন এক ফুৎকারেই নিভে গেল। সে বুঝল, পদ্ম-পত্রের জলবিন্দুর মতো, সুদের কারবারও ক্ষণস্থায়ী। ঋণের দায়ে ভিটে-মাটি উচ্ছন্নে যাওয়ার আর কোন প্রশ্নই রইল না কারও। অবিনাশ বাড়ুজ্জে মুক্ত—হিসেবের ঐ লাল খাতাগুলো যদি আজ তাঁকে মুখ ভেংচে বিদ্রূপ করে, তবে লজ্জায় অবিনাশ বাড়ুজ্জের মুখ লাল হ'য়ে উঠবে, তেমন কোন কারণ নেই। সে এখনো সুরাজপুর ত্যাগ করে নি, তবে যে-কোন দিনই ত্যাগ করতে পারে।

কিন্তু বিপদ হয়েছিল সরোজ ঘোষকে নিয়ে। কোলের শিশুটা আজ ক'দিন থেকে পীড়িত। শিশুটার দিন-দিনই জ্বরের উত্তাপ বাড়ছিল, কিন্তু তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন যে দিন-দিনই সুরাজপুরের হিন্দু অধিবাসীরা সব গ্রামত্যাগ করছে। পীড়িত শিশুর জ্বরের উত্তাপ

হিন্দুস্থানগামী পথচারিদের চলার পথে কোন বিঘ্নই সৃষ্টি করে নি। গ্রামের ডাক্তার সব চলে গেছেন। চট্‌ ক'রে ওষুধের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। ফকিরের দরগার দাওয়াই দিয়ে হিন্দু শিশুর জ্বরের উত্তাপ কমানও সম্ভব নয়। সরোজ ঘোষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন। সুরাজপুর যখন প্রায় শূন্য হ'য়ে এল, তখন তিনি স্ত্রী, যুবতী কন্যা ও পীড়িত শিশুটিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

বেশীদূর পর্য্যন্ত তা'কে বোঝা বহন করতে হয় নি। শিশুর আয়ুষ্কাল, হিন্দুস্থানের এলাকায় পৌঁছবার আগেই নিঃশেষ হয়ে গেল। সরোজ ঘোষ এ'বার ছুটল খুব দ্রুতবেগে। যা'রা এগিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গ না পেলে, যাত্রার মাদকতা রইল কই?—যা'রা ওকে পিছনে ফেলে জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, তারা ব্যর্থ হ'লো। গতির বেগে মৃত শিশু-পুত্রের সৎকারের কথা ভাবা আর সম্ভব হ'লো না। অথচ প্রাণহীন এ'টুকু একটা অস্থিচর্ম্মসার জড়পিণ্ডের জন্য উড়ে আসছে অসংখ্য শকুনী। অজানা আকাশের উড়ন্ত শকুনী খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে পাকিস্থান প্রান্তরে উড়ে এসে ব'সে গেল শকুনীর দল। সরোজ ঘোষের ভাগ্য ভাল। এ'দৃশ্য তাকে দেখতে হয় নি। কলকাতার রিফিউজি ক্যাম্পের তালিকায়, সরোজ ঘোষের শিশু-পুত্রের নাম থাকবে না।

* * * *

স্বাধীনতার লাল সূর্য্যকে ওরা আহ্বান ও আমন্ত্রণ করল সামরিক ও বে-সামরিক বাদ্য-ঝংকারে। মুন্সী পাড়ার শানাই-যন্ত্রী ওস্‌মান্‌ খাঁ তার সাকরেদদের নিয়ে সুর ধরেছে প্রত্যূষের প্রথম প্রহর থেকে। পাকিস্থানের প্রথম জন্মদিনে, সানাই-এর সুরে নতুনত্ব ছিল না। হিন্দু-বাড়ীর বিবাহ-আসরের যে-সব সুর ওস্‌মানের রপ্ত করা ছিল, আজকের শানাই-বাদ্যেও সে-সব পরিচিত সুরেরই পরিচয় পাওয়া গেল। পাকিস্থানের প্রথম প্রভাতে ওস্‌মানের সুরের খেলায় প্রাচীনত্ব থাকলেও, আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

কাজী পাড়ায় শুনতে পেলুম বিউগল্‌ বাজছে। পা মিলিয়ে হাঁটবার অভ্যেস ওরা কিছুদিন আগে থেকেই সুরু করেছিল। আমার বাড়ীর বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একদল ছেলে সামরিক সুরে উত্তেজিত হ'য়ে হেমন্ত মুদীর দোকানটা লুট করতে আরম্ভ করেছে। মশ্‌লা আর বাতাসার বস্তাগুলো মাথায়-পিঠে ক'রে, নিরাপদে বাড়ীর দিকে রওনা হ'য়ে গেল। কণ্ট্রোলের বাজারে, হেমন্ত মুদীর ঘরে সরষের তেলের টিন্‌ একরকম থাকত না ব'লেই সবাই জানত। এক সেরের প্রয়োজনে, এক পোয়ার অধিক কেউ অনেক দিন থেকেই পাচ্ছিল না। কিন্তু আজকে যখন লুট হ'তে থাকল, তখন দেখতে পেলুম, হেমন্ত মুদীর ঐটুকু ঘর থেকে দশটা তেলের টিন্‌

বেরিয়ে এল। এক-একটা টিন্ দু'জনায় ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। হেমন্ত মুদী রাস্তার বিপরীত দিক থেকে নির্ব্বিকারভাবে এ' দৃশ্য দেখতে লাগল। ইংরেজের দয়ায় হেমন্ত মুদী কালো-বাজার থেকে পয়সা কামিয়েছে প্রচুর। অর্থের প্রচুরতায়, দশ টিন্ তেলের লোকসান্ আর কতটুকুই বা হ'বে!

হেমন্ত মুদীর লোকসানের অনুপাত দিয়ে, সমস্ত সুরাজপুরের লোকসান অনুমান করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর্থিক ক্ষতির উচ্চতায়, সমাজ-জীবনের মূল খুঁজে পাওয়া সহজ হ'বে না। গত মন্বন্তরের সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষায়, রাস্তা-ঘাটে শব দেহের সংখ্যাধিক্যে, আধুনিক সভ্যতা-বিলাসীদের চক্ষে জল এসেছিল সত্য, কিন্তু আজকের সুরাজপুরে শবদেহের আধিক্য না থাকলেও, সর্ব্বনাশা লোকসানের মূল-গত অর্থের ভয়াবহতা তোমরা বুঝতে পারছ কি না বলতে পারি না। কাব্যের ঝংকারে বাংলার মাটি, বাংলার জল ধন্য হয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে —যতির আয়েসে ও শ্রুতিমধুরতায় বাঙ্গালীর জীবন রূপ পরিগ্রহ করেছে কবিতার কল্পলোকে। বাংলার মাটিতে ও জলে, বাঙ্গালী চরিত্রের ও জীবনের বৈশিষ্ট্য সুপরিজ্ঞাত। আরবের মরুভূমিতে বাঙ্গালী বাঁচবে না, রাজপুতনার গিরিবর্ত্মে ব'সে আমরা কি পারি আগামী দিনের নির্ভুল নির্দ্দেশ দিতে? উত্তর-ভারতে

আমরা শতবর্ষ বসবাসের পর ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠি। বাংলার দিগ্‌বিজয়ী প্রাতঃস্মরণীয় সন্তানের তালিকায় খুঁজে পাই না এমন একজনকে যিনি বাইরের আকাশ থেকে উড়ে এসে, আমাদের জীবনাকাশের নৈঋত কিংবা ঈশান কোণেও রেখে গেছেন ভবিষ্যের মঙ্গল-সংকেত। লণ্ডন কিংবা নিউ-ইয়র্কের আধুনিক স্বাচ্ছন্দ ও পরিচ্ছন্নতার লোভনীয় পরিবেশের মধ্যে বসবাস ক'রেও আমরা ফিরে আসতে চাই বাংলার পলিমাটির লোভে। আমাদের স্বকীয়তা আমাদের মাটিতে, রূপ ও রসে মহান্ ও মহিমান্বিত। কিন্তু ওরা সব চল্লো। তোমরা বলবে যে বাংলার এক অংশ থেকে অপর অংশে যাচ্ছে—সুতরাং চারিত্রিক স্বকীয়তা বিকাশের অবকাশ ও সুযোগ ওদের রইল। তোমাদের ক্যাম্প খুলবার মূলে এমন একটা নৈতিক যুক্তি না থাকলে, চাঁদার খাতায় টিপ-সই দিয়ে অজ্ঞজনের পকেট থেকে অর্থ-সংগ্রহে অসুবিধা আছে, সে আমি জানি। ক্যাম্প খোলার লোভনীয় কারবারের নিয়মানুসারে, তোমরা কত পারসেণ্ট ক'রে কমিশন পেয়ে থাকো, সে'কথা আমার জানা নেই।

*　　*　　*　　*

তোমার কলকাতার প্রাসাদে পাকিস্থান পত্র বিন্দুমাত্র আলোড়ন সৃষ্টি করবে, তেমন কোন দুরাশা আমার নেই। রবিবারের কর্মহীন অপরাহ্ণে সুবিস্তৃত শয্যায়, পাকিস্থান-

পত্র যদি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায়, তবেই বুঝব আমার পত্র-লেখা সার্থক হয়েছে।

মনে মনে আশঙ্কাও বড় কম নয় যে শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান সীমান্ত অতিক্রম ক'রে এই পাণ্ডুলিপি তোমাদের হস্তগত হ'বে কি না। যদি তোমাদের দুষ্কৃতির জন্য আমরা সবাই এ-রাজ্যে জীবন দানে দণ্ডনীয় হই, তবে ভবিষ্যতের কোন অভাবনীয় আকস্মিকতায় হয়তো বা আমার পাকিস্থান পত্রের মুদ্রিত কপি তোমার কাছে পৌঁছাতেও পারে। পরলোকে ব'সে আমি সান্ত্বনা পা'ব এই ভেবে যে আমি যা'কে হারিয়ে এলুম, তোমরা তা'কে খুঁজে পেয়েছ আর মুদ্রণে তার সমাদরও করেছ। ইতি—

———

তোমরা তো চলে গেলে। ব'লে গেলে হিন্দুস্থানে যাচ্ছ। আমাদের সুরাজপুর থেকে হিন্দুস্থানের দূরত্ব অবশ্যি আধ মাইলও নয়, তবু তোমরা হিন্দুস্থানে গেছ মনে হ'লেই ভাবি, সে যেন কতদূর! দূর তো নিশ্চয়ই—হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান দু'টো আলাদা রাষ্ট্র।

আমাদের বাড়ীর দোতলা থেকে, দু'টো রাষ্ট্রের সীমানা বেশ পরিস্কার দেখা যায়। দু'টো রাষ্ট্রের সীমানা সে'দিন টানা হলো লালামিঞার জমির উপর দিয়ে। তুমি তো জান কিছুদিন আগে এই জমিটুকুর জন্য সদর পর্য্যন্ত গিয়ে বসিরুদ্দীনের সংগে লালামিঞা মোকদ্দমা লড়ে এসেছে। এখন পর্য্যন্ত 'রায়' মুলতুবী আছে।

সেদিন পাকিস্থানের পাহারাওয়ালা এল শ'দুয়েক, সংগে এলেন অনেক রাজকর্মচারী। দু'দিন আগে থেকেই শুনা যাচ্ছিল, সুরাজপুরের বুকের উপর দিয়ে পাকিস্থানের সীমানা টানা হবে।

জা'গা-জমি জরীপ হ'লো। পাকিস্থানের সীমান্ত হ'লো, লালামিঞার জমির উপর দিয়ে। আদর-অনাদরে, প্লাবনের-পীড়নে, অনাবৃষ্টির নিষ্ঠুরতায় এই জমিটুকু তার উৎপাদন থেকে, লালামিঞাকে কোনদিনই বঞ্চিত করে নি। বছরের দু'টো উৎপাদনেরই হিসেব লালামিঞার

মুখস্ত, কিন্তু বছরের মোকদ্দমা খরচের হিসেব, সে কোন-দিনই মনে রাখে না। বসিরুদ্দীনের সংগে, সে জিলা-কোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা লড়েছে বটে, কিন্তু 'রায়' এখনও মুলতুবী আছে। লালামিঞা কি করবে? জিলা-কোর্টের জজ সাহেব হিন্দুস্থানে চ'লে গেছেন—পাকিস্থানের নূতন জজ না আসা অবধি, 'রায়' বেরোবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

জিলার বড়কর্ত্তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল লালামিঞা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুর, যে-জমির উপর তাঁবু ফেল্লেন, তার নীচে রয়েছে আউশ ধানের চারা।" 'খাদ্য-শস্য বাড়াও' বিভাগের মৌলবী নূরুল হুদা সাহেব বল্লেন, "আউশ ধানের চারা দিয়ে আর কি হ'বে লালামিঞা? তোমার তো নসিব ভাল, তোমারই জমির উপর দিয়ে, পাকিস্থানের ফ্রন্টিয়ার তৈরী হচ্চে।"

লালামিঞা পুনরায় প্রশ্ন করল, "তা'র মানে কি হুজুর?" জিলার বড় হুজুর বাংলা জানেন না, তাই নূরুল হুদা সাহেবই উত্তর দিলেন, "হিন্দুস্থানের সংগে আমাদের সীমানা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হ'বে। এইখান দিয়ে আধ মাইল চওড়া ক'রে, আঁকা-বাঁকা লাইন ধ'রে সোজা চ'লে যাব উদয়দীঘির খাল পর্য্যন্ত। ওপারে যদি হিন্দুস্থানের লোক ঘণ্টা বাজিয়ে মূর্ত্তি পূজা করে, তবে এ'পারের মসজিদে সে শব্দ আর পৌছতে পারবে না।"

শব্দের দূরত্ব বজায় রাখতে পারলেই, ধর্মের দূরত্ব বজায় থাকবে।

"তাতো পারবে না হুজুর—কিন্তু আউশ ধানের চারাগুলোর উপায় হ'বে কি ?"

উপায় আর কি হ'বে, সংগে ছিলেন জিলার বড় কনট্রাক্টর জসীমউদ্দীন সাহেব। পনেরো মাইল পর্য্যন্ত যে-সীমান্ত খনন হবে, তা'র পুরোপুরি ঠিকেদারি তিনি একাই পেয়েছেন।

লালামিঞা যেন তারই অধীনে একটা সাব-কনট্রাক্ট পায়, সে-চেষ্টা জসীমউদ্দীন সাহেব নিশ্চয়ই করবেন। সীমান্ত খননের কাজ যখন সুরু হ'লো, তখন লালামিঞার মোকদ্দমার 'রায়' বেরোয় নি।

* * * *

আজ ক'দিন হলো সীমান্ত খননের কাজ শেষ হ'য়েছে। আমার ঘরের বারান্দা থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেই সীমান্ত-রেখা। যে-কোন ছোট শহরের নর্দ্দমার মতো সরু, এপার থেকে ওপারে ডিঙ্গিয়ে যেতে কোন কৌশলেরই দরকার হয় না। এই সরু নর্দ্দমাটাই সুরাজপুর থেকে উদয়দীঘির খাল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে।

ললামিঞা সাব-কনট্রাকট্ নেয় নি। আউশ ধানের কচি চারাগুলোর গায়ে কোদাল মেরে, পাকিস্থানের সীমান্ত খনন করতে সে সম্মত হয় নি।

কিন্তু সেই সীমান্ত রক্ষা করতে যে-ভলান্টিয়ার রক্ষীদল সৃষ্টি হয়েছে, তা'র সেনাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছে আমাদের লালামিঞা।

*　　*　　*　　*

চেহারার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে লালামিঞার।

মাথায় এখন আর ইস্‌লামী টুপী পরতে হয় না। সবুজ রং-এর ভেল্‌ভেট কাপড়ের তেরছা ক'রে কাটা একফালি টুপী। টুপীর গায়ে রাংতা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে তুর্কী দেশের ইস্‌লামী-চাঁদ। বাঁ-দিকের কাঁধ থেকে একটা সূতো নেমে এসে তার বুক পকেটে ঢুকেছে। সূতোর একপ্রান্তে বাঁধা আছে পাকিস্থানী বাঁশী। ডান পকেটের মধ্যে লালামিঞা রেখেছে পিস্তল। লম্বা প্যাণ্টের ব্যবস্থা শীগ্‌গীরই হবে: খবর পাওয়া গেছে শীতের আগেই করাচী থেকে এসে যাবে। লম্বা প্যাণ্ট এসে গেলে লালামিঞা জানে, পিস্তলটা বাঁ দিকের কটিবন্ধের সংগে ঝুলিয়ে দেবে। এখন তার তু'টো বুক পকেট-ই উঁচু হ'য়ে থাকে, কষ্ট ক'রে লালামিঞাকে আর বুক ফোলাতে হয় না। নীচের দিকে বুশ্‌-সার্ট যেখানে এসে শেষ হ'য়ে গেল, সেখান থেকেই লালামিঞার লুঙ্গীটা দেখা যাচ্ছে। এই জীর্ণ লুঙ্গীখানাই, অবিভক্ত বাংলার পুরনো স্মৃতি।

কিন্তু লালামিঞার কাছে স্মৃতির কোন মূল্য নেই। অবিভক্ত বাংলার কথা আর সে মনেই করতে পারে না। সুখদুঃখ বিজড়িত জীবনের দিনান্তে সুরাজপুরের সহস্র স্মৃতি এনেছে আশা, এনেছে পুলক। প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের কণ্টকিত মুহূর্তেও লালামিঞা ভেবেছে সুরাজ-পুরের মতো দেশে জন্মেও সুখ আছে। জীবন সংগ্রামের গুরুভারেও মানসিক ক্ষুদ্রতার প্রকাশ-সম্ভাবনা ছিল না। দুঃখ তা'র মাঝে মাঝে হয়—সুরাজপুরের তিন বিঘে জমিতে তার আর কোন দখল নেই। রাজনৈতিক মুক্তির প্রবাহে ভেসে গেল লালামিঞার জমির দখলীস্বত্ব। বসিরুদ্দীনের সংগে সে বছরের পর বছর এই জমির জন্য মোকদ্দমা লড়েছে। কতো পয়সাই না সে দিয়ে এসেছে সদরের উকীল আর মোক্তারের পকেটে! লালামিঞা ডান দিকের পকেটে অনুভব ক'রে দেখল, পিস্তলটা তার ঠিক আছে কি না। আহা, অবিভক্ত বাংলায় এমন জিনিষ যদি সে হাতে পেত তা' হলে বসিরুদ্দীনের মোকদ্দমার 'রায়' বেরুতে ক' মিনিট আর সময় নিত? কথাটা ভেবে ভেবে লালামিঞা ঘেমে ওঠে। মাথা থেকে উত্তেজনাটা যেন কেমন সুড়্ সুড়্ ক'রে নীচের দিকে নামতে থাকে— বুশসার্ট আর লুঙ্গীর সীমানা পর্য্যন্ত এসে থেমে যায়। লালামিঞার হঠাৎ মনে পড়ে যে অবিভক্ত বাংলায় মোকদ্দমার 'রায়' দেবার ক্ষমতা তার হাতে ছিল না।

পিস্তলটা হাতে নিয়েই লালামিঞা পাকিস্থানের সীমান্তে পায়চারি করতে থাকে। পায়ের নীচে তারই সেই তিন বিঘে জমি।

অন্ধকার হ'য়ে এল, অমাবস্যার রাত। সন্ধ্যের সময় থেকেই এ অঞ্চলে আর লোক চলাচল ক'রে না। ছ'টো আলাদা রাষ্ট্রের ব্যবধান-চিহ্ন এই নির্জ্জনতায় সম্যক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ছ' শ' বছরের পরিচয় যেন আজকে উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তে এসে মিশে যায় সীমাহীন অপরিচয়ের অন্ধকারে। হঠাৎ সে দেখতে পেল, বোরকা প'রে, কে যেন একজন পাকিস্থানের সীমানা পেরিয়ে, নর্দ্দমাটা লাফিয়ে ওপারের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

লালামিঞা ছুটল পেছনে পেছনে। চীৎকার দিয়ে বল্লো, "কে যায়? দাঁড়াও, নইলে গুলি করব।"

দাঁড়িয়ে গেল বোরকা—।

"তুমি কে?"

"আমি হিন্দু।"

"বোরকা কেন?"

"আমায় ওরা নোয়াখালী থেকে লুট করে এনেছিল।"

সবুজ রং-এর টুপীটা ডানদিকে আর একটু হেলিয়ে দিয়ে, লালামিঞা জিজ্ঞাসা করল, "পালাচ্ছ কেন? স্বাধীন পাকিস্থান তোমার ভাল লাগল না?"

সবুজ রং-এর টুপী নোয়াখালীর মেয়ে অনেক দেখেছে। তাই যেন সে একটু ভয় পেয়েই জবাব দিল, "আমায় ফিরে যেতে দাও। রইলাম তো অনেকদিন।"

"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম মালতী।"

"সে তো অনেকদিনের পুরনো নাম। পাকিস্থানে এসে নাম বদলাও নি ?"

বোরকাটা এবার সে মাটিতে ফেলে দিয়ে উত্তর দিল।

"হ্যাঁ—আমায় ওরা ডাকে নূরজাহান বলে।" অমাবশ্যার রাতে, নূরজাহানকে চিনতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

নূরজাহানই বটে ! লালামিঞা ভাবছে, হিন্দুস্থানের মালতী পাকিস্থানে এসে নূরজাহান হয়েছে। ওকে ছেড়ে দে'য়া যায় না। ওকে ফিরিয়ে না নিয়ে যেতে পারলে, পাকিস্থানের ক্ষতি। যা'রা ওকে ভয় দেখিয়ে ধরে রেখেছিল তা'রা ওকে হারিয়েছে,—লালামিঞা যদি তা'কে আপনার করতে পারে, তবে নূরজাহান কেন মালতী হ'তে যাবে ?

"আমায় এবার যেতে দাও। ওরা সব এসে পড়বে।"

আশ্চর্য্য, ওরা এসে পড়বে ব'লে মালতী ভয় পায় কেন ? ভারতবর্ষের ইতিহাসে ওরা কতবার এসেছে,

কতবার মালতী নূরজাহান হয়েছে—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ওরা ভবিষ্যতে আবারও যে আসবে না, তা'র কি প্রমাণ আছে ?

কিন্তু ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তের লালামিঞা হিন্দুস্থানের মালতীকে বারবার ক'রে অনুরোধ করছে : "তুমি ফিরে চলো।"

এমন সময় দূরে লোকের চীৎকার শোনা গেল, "আল্লা-হো-আকবর !"

মালতী বল্লো, "ঐ যে ওরা আসছে, আমায় যেতে দাও।"

ওরা সত্যিই এসে গেল। লালামিঞা পিস্তল হাতে এগিয়ে গেল নর্দ্দমাটার ওপারে, পাকিস্থানের এলাকায়।

বসিরুদ্দীন এসেছে মালতীকে নিয়ে যেতে। লালামিঞার হাতটা একটু কেঁপে উঠল। বসিরুদ্দীন বল্লে, "নূরজাহানকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

"কিন্তু নূরজাহান ফিরে যেতে চায় না।" লালা-মিঞার জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

"আমরা জোর ক'রে নিয়ে যাব—"চীৎকার ক'রে উঠল বসিরুদ্দীনের দল।

লালামিঞা পিস্তলটা বসিরুদ্দীনের বুকের উপর ঠেকিয়ে দিয়ে বল্লো, "তুমি পালাও মালতী।" পূর্ব্ব

পাকিস্থানের সীমান্তে সে’ রাত্রে শুধু শোনা গেল, “আল্লা-হো-আকবর!” হিন্দুস্থান থেকে কোন জবাব এল না।

* * * *

সুরাজপুরের স্কুল বাড়ীতে মিটিং বসেছে।

পাকিস্থান ভলান্টিয়ার রক্ষীদলের বড়কর্ত্তা মহম্মদ উজবেক খাঁ এসেছেন রাজধানী থেকে। সুরাজপুরের স্কুল বাড়ীতে যে-সব চেয়ার আর বেঞ্চি ছিল, সে সবই গেল বছরের দাঙ্গার সময় লুট হ’য়ে গেছে।

“মহম্মদ উজবেক খাঁ আসছেন সভায়, তা’কে বসতে দেবো কি?” কে একজন প্রশ্ন করল ভীড়ের পেছন থেকে।

সফিউল্লা জবাব দিল, “কেন, সুরাজপুর ইউনিয়ন-বোর্ডের সভাপতি দবিরুদ্দীনের বাড়ীতে কি চেয়ারের অভাব আছে? সেখান থেকে ক’খানা চেয়ার আগে থাকতে নিয়ে এলেই হ’তো।” একরামুল্লা ব্যাপারটা ফাঁস্ ক’রে দিয়ে বলে, “সে-সব চেয়ারে যে সুরাজপুর স্কুলের ছাপ্ মারা আছে। পাকিস্থান হয়েছে ব’লে কি পাকিস্থানে পুলিশ-দারোগা থাকবে না?”

পুলিশ দারোগা কিছুদিন পর্য্যন্ত সুরাজপুরে সত্যিই ছিল না। হিন্দুর পয়সায় স্কুল হয়েছে, লুটের বাজারে তাই চেয়ারগুলো বিকিয়ে গেল দবিরুদ্দীনের কাছে জলের দামে!

সামরিক পোষাক পরে, মহম্মদ উজবেক খাঁ এলেন স্কুল বাড়ীতে। পেছনে ছিলেন ইউনিয়ন-বোর্ডের সভাপতি দবিরুদ্দীন সাহেব। রাজধানীর বড়মানুষরা চিরদিনই দবিরুদ্দীন সাহেবের বাড়ীর সব মান্য অতিথি।

উজবেক খাঁ সভা-প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়াতেই, সবাই চীৎকার ক'রে উঠলো, "আল্লা-হো-আকবর।" উজবেক খাঁ জবাব দিলেন, "পাকিস্থান জীন্দাবাদ্।" সমবেত জনতা তখন পুনঃপুনঃ চীৎকার করতে লাগল, "আল্লা-হো-আকবর, পাকিস্থান জিন্দাবাদ।" সেই শব্দ যেন পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

মনে হ'লো, প্রথম ধ্বনিটা অত্যন্ত চেনা, অত্যন্ত পুরনো। হিন্দুকুশে কতবার এই ধ্বনিটাই প্রতিধ্বনিত হয়ে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়েছে।

মনে হচ্ছে, সেই ধ্বনিটাই যেন আজকেও আবার প্রায় দুই শতাব্দী পর পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সুরাজপুরগ্রামে নূতন ক'রে শক্তি সঞ্চয় করছে। দু' ফুট চওড়া নর্দ্দমার মতো সীমান্তটা তো বোরকা প'রেই লাফিয়ে পার হওয়া যায়! তিন শ' মাইল দূরের মালতী, সুরাজপুরের বসিরুদ্দীনের ঘরে নূরজাহান হ'তে ক'ঘণ্টা সময় নিয়েছিল? সুচরিত, তুমি মনে করছ আমি সাম্প্রদায়িক —সত্যিই, হিন্দুর পক্ষে সাম্প্রদায়িক হওয়া নাকি স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু মহম্মদ উজবেক খাঁর সাম্প্রদায়িকতা

ঐতিহাসিক ঘটনা। সোমনাথ থেকে স্বরাজপুর পর্য্যন্ত সে সাম্প্রদায়িকতার এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নি।

সামরিক কায়দায় হুঙ্কার দিয়ে, মহম্মদ উজবেক খাঁ বল্লেন, "কায়েদ-আজমের আদেশ,—মুসলমামের মধ্যে কোন দলাদলি থাকবে না।" যেন কোরআন-শরীফে কথাটা লেখা আছে মনে ক'রে, লালামিঞা বসিরুদ্দীনের একটু গা ঘেঁসে বসল।

হুঙ্কারের শেষের দিকটা আর একটু জোরালো ক'রে তিনি বলেন, "লালামিঞা কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছে—পাকিস্থানের নূরজাহান হিন্দুস্থানে পালিয়ে গেছে।"

"তোবা, তোবা", জনতা কলরব ক'রে উঠল।

"কিন্তু এ লোকসান শুধু বসিরুদ্দীনের নয়, এ লোকসান সমগ্র পাকিস্থানের। ঐ যে পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্ত"—কথা শেষ হওয়ার আগেই সমগ্র জনতা উত্তেজিত হ'য়ে সেই নর্দ্দমার ওপারে যেন তখুনি ছুট্‌তে চায়!

মহম্মদ উজবেক খাঁ যেন মহম্মদ ঘোরীর মত থানেশ্বর অভিযানের রিহার্সাল দিচ্ছিলেন! ভারতবর্ষের সম্পদ চিরদিনই বলিষ্ঠ পাঠানকে লালায়িত করেছে—আর আজকে পলাতকা নূরজাহানের জন্য ঐ নর্দ্দমাটা ডিঙ্গিয়ে যাওয়া এমন কি কষ্টকর? যে-লোকসান সমগ্র পাকিস্থানের, সে-লোকসানের পূরণ করতে মুসলমানের ভয় পেলে চলবে কেন? উজবেক খাঁ সীমান্তের দিক

থেকে আঙ্গুলটা ঘুরিয়ে নিয়ে লালামিঞাকে উদ্দেশ্য ক'রে বল্লেন, "এ' লোকসানের পূরণ করতে হ'বে। কাফেরের সংখ্যা যদি কমে,তা হ'লে পাকিস্থানের ষোল আনা লাভ।"

কথাটা বলার সংগে সংগে সবাই যেন সুরাজপুরের জমিদার সুচরিত বসুর অন্দর মহলের কথা স্মরণ করল। কিন্তু তুমি তো তোমার মেয়ে অজন্তা আর বাসুকে নিয়ে পাকিস্থান পোক্ত হওয়ার আগেই কলকাতায় চলে গেছ। সুতরাং সুরাজপুর গ্রামে অত তাড়াতাড়ি নয়া-নূরজাহানকে পাওয়া যা'বে না মনে করেই উজবেক খাঁ কৌশল ক'রে বল্লেন, "আজকের সভায় আমি লালামিঞাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পাকিস্থানের এই ক্ষতি সে যত তাড়াতাড়ি পারে, যেন পূরণ ক'রে দেয়। বসিরুদ্দীন ততোদিন অপেক্ষা করবে।"

দু'দিন আগে জেলা-কোর্টের রায় বেরিয়েছে। বসিরুদ্দীন সে-মোকদ্দমায় হেরেছে।

মহম্মদ উজবেক খাঁ সভার শেষে সামরিক কায়দায় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি দবিরুদ্দীন খাঁর সংগে, মার্চ ক'রে এগুতে লাগলেন। পেছনে তিনি শুনতে পেলেন, "আল্লা-হো- আকবর!"

সে রাত্রিতে আমি আর ঘুমোতে পারি নি। নিজের জীবনের জন্য ভয় ছিল না, ভয় ছিল আরও দশ জনের জীবনের জন্য। তারাও সে রাত্রে ঘুমোতে পারে নি।

কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি যে ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি করতেন। থানেশ্বর থেকে পানিপথ কত বছর? এই দীর্ঘ সময় যারা ঘুমোতে পারে নি তারা সব ইতিহাসের পাতায় জেগে নেই কেন? পলাশীর পরে যারা রায়বাহাত্বর হয়ে রাজানুগ্রহ লাভ করল, তাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা পলাশীর পূর্ব্বে কোন্ বাহাত্বর হয়ে রাত কাটিয়েছে?

লালা মিঞারা কায়েত পাড়া হ'য়ে যখন বামুন পাড়ার দিকে যাচ্ছে, তখন নমশূদ্রেরা যুদ্ধ করবে ব'লে এ-বাড়ী ও-বাড়ী অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘরের দরজায় শত্রু এসে গেলে যদি অস্ত্র খুঁজে নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়, তবে সে অস্ত্র পাওয়া যায় না। অস্ত্র যদি দৈবাৎ পাওয়াও যায় তবে যুদ্ধ জেতা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পেছনে যদি নৌকো ত্ন'একখানা থাকে, তবে সে নৌকো চেপে বড় জোর বিক্রমপুর পর্য্যন্ত যাওয়া চলে।

লালা মিঞা জানত যে বামুন পাড়ায়ও এমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবার নেই যেখানে বসিরুদ্দীনের জন্য কোন নূরজাহান মিলতে পারে। তাই সবাই যখন কায়েত পাড়ার ব্যর্থতা নৈরাশ্যে মগ্ন, সেই সময় দলের চার পাঁচজনকে নিয়ে লালা মিঞা দলভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। কিছুদূর আসবার পর, গফুর মিঞা জিজ্ঞাসা করল, "সুদখোর অবিনাশ বাড়ুজ্জে এখনো পালায় নি। যাবে সেথায়?"

লালা মিঞার কণ্ঠস্বরে অনিচ্ছার আভাস। তবুও সে বল্ল, "মনে তো হয় না সেথায় কোন নূরজাহান মিলবে।"

গফুর জবাব দেয়, "ও-সব বে-ইজ্জতির কাজে আমার কোন লোভ নেই মিঞা। বাড়ুজ্জে ব্যাটার কাছে অনেক টাকা, চলো না একবার যাই, কি বলে শুনি।"

লালা মিঞা পুনরায় অনিচ্ছার আভাস দিয়ে বলে "তার চাইতে চল্ ঘরে ফিরে যাই গফুর। দু' ছিলিম তামাক সেজে দু'জনাতে বসে বেশ নিরিবিলিতে সুখ-দুঃখের গল্প করি।"

"আরে মিঞা, কিছু যদি পয়সা কামিয়ে নিতে পারি, তবে না পাকিস্থানে কল্‌কে জ্বালিয়ে সুখ টান দিয়ে আরাম আছে।"

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে গফুর যেন অবিনাশ বাড়ুজ্জের বাড়ীর দিকে মোড় ঘুরল। লালা মিঞা বল্ল, "গফুর পাকিস্থানের কল্‌কে এখন জ্বলবে না। তার চাইতে চল্ না একবার যাই রাজপুরে? সেখানে তোদের নূরজাহানের সংগে মোলাকাত হওয়া অসম্ভব নয়।" গফুর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "খাঁ সাহেবের হুকুম না নিয়ে, হিন্দুস্থানে তুমি যা'বে কি ক'রে মিঞা? তোমার মতলবটা কি শুনি?"

"আচ্ছা চল্ গফুর, বাড়ুজ্জে মশাইয়ের কাছেই যাই।" তাই লালা মিঞারা এল বামুন পাড়ায়।

বামুন পাড়ার অবিনাশ বাড়ুজ্জে ছাড়া, আর সবাই হিন্দুস্থানে চলে গেছে। লালা মিঞা সবুজ রং-এর টুপিটা মাথায় পরেছে, হাতে নিয়েছে পিস্তল।

অবিনাশ বাড়ুজ্জে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে কায়েত পাড়ার হল্লা শুনছিল। অবিনাশ বাড়ুজ্জে কি করবে? লালা মিঞাকে দেখে অবিনাশ বাড়ুজ্জে ভাবছিল যে সে বুঝি তার কাছে আউশ ধানের ভাগ বিক্রি করতে আসছে।

কিন্তু যুদ্ধের পোষাক দেখেও অবিনাশ বাড়ুজ্জেরা বুঝতে পারে না যে ধানের ভাগ বেচতে কেউ পিস্তল হাতে আসে না।

ইতিমধ্যে করিম শেখ আর রহিম ভুঁঞা ঢুকে পড়ল অবিনাশ বাড়ুজ্জের অন্দর মহলে।

শেষ পর্য্যন্ত লালা মিঞার পিস্তলের মুখে বুক ঠেকিয়ে অবিনাশ বাড়ুজ্জে অহিংস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমনি অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে অবিনাশ বাড়ুজ্জের কোন লজ্জাই হচ্ছে না।

সে জানে, ভারত সরকার নিজেই পাকিস্থানের পিস্তলের মুখে এমনি করে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্দর মহলে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর, নূরজাহান তো দূরের কথা কোন স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া গেল না। অবিনাশ বাড়ুজ্জে লালা মিঞাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোরা কি চাস্? টাকা পয়সা চাস্‌তো দু'দশ টাকা দিতেপারি।"

গফুর মিঞা জিজ্ঞাসা করে, "কেন ঠাকুর, দু'দশ টাকা কেন? আমরা কি তোমার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি নাকি? দু' শ' বছর থেকে তো সুদ খেয়ে খেয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছ, সে টাকাগুলো সব গেল কোথায়?"

"তোরা তো আহম্মক কম নয় গফুর। সে সব টাকা যে অনেকদিন আগেই কলকাতার ব্যাঙ্কে সরিয়ে ফেলেছি।" অবিনাশ বাড়ুজ্জে কথাটা শেষ করে হঠাৎ কাছাটা টান দিয়ে খুলে ফেল্ল। কাছার এক কোনায় বেশ শক্ত করে গিঁট বাধা ছিল। দাঁত দিয়ে গিঁট খুলে, অবিনাশ বাড়ুজ্জে বা'র করল দু'টো দশ টাকার নোট।

"তোদের কায়দে আজমের দিব্বি দিয়ে বলছি যে এখন এই কুড়িটা টাকাই নিয়ে যা গফুর।"

গফুর বল্লো, "কাছাটা যখন খুলেই ফেল্লে ঠাকুর, তখন আর ধুতি পরা কেন? কোঁচাটাকে খুলে বেশ লুঙ্গির মত করে লেপ্টে পেঁচিয়ে নাও। তারপর চলো একবার ম'জিদ হয়ে একবারে দবিরুদ্দীন সাহেবের বাড়ী—সেখানে কোপ্তা কাবাব পাকানো হচ্ছে, দু'চার থালা সাবাড় ক'রে বাড়ী ফিরে আসবে।"

গফুর মিঞা অবিনাশ বাড়ুজ্জের কোঁচার কোনা ধরে বেশ জোরেই একটু টান দিল।

"আহা, আহা, করিস কি গফুর?"

বাড়ুজ্জে অসহায়ের মতো চীৎকার করে ওঠে।

"আচ্ছা, আচ্ছা, এই নে, কোঁচার খুঁটে আরও শ' দু'য়েক টাকা আছে তা'ও বরঞ্চ নে।"

কিন্তু লালা মিঞা প্রশ্ন করল, "ঠাকুর তোমার মেয়ে আন্নাকালী কোথায়? টাকা খরচ হ'বে বলে, তার তো সাদি এখনো দাও নি? তোমার ঘরে সে ভাল ক'রে খেতে পায় না, বসিরুদ্দীনের ঘরে গিয়ে সে নূরজাহান হবে।"

"সে কি আর আছে রে লালা। সেই যে হরেন চাটুজ্জের ছেলেটা, হ্যাঁরে, সেই ভবঘুরেটা, কংগ্রেসের হয়ে খুব ক'দিন বক্তৃতা দিল, হিন্দু-মুস্লিম ভাই-ভাই--দেশের মাটি ছাড়ব না—সেই ছেলেটাই আমার আন্নাকালীকে ফুঁসলিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেছে। ১৫ই আগষ্ট ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার আন্নাকালীও নেই আর হরেন চাটুজ্জের ছেলেটাও নেই। তোদের পাকিস্থানের প্রথম সূর্য্য ওঠা কি আর ওরা দেখতে পেল রে লালা।"

কিন্তু লালা মিঞা দেখতে পেল, করিম শেখ আর রহিম ভুঁঞা দু'জনে একটা লোহার সিন্দুক টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছে। সুদের টাকায় ভর্ত্তি লোহার সিন্দুকটা বাইরে নিয়ে আসতেই যেন ওরা হঠাৎ নূরজাহানের কথাটা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল। আন্নাকালী গেছে যাক, লোহার সিন্দুকটা তো যায় নি, এই কথা মনে ক'রে লালা মিঞা বল্লে "দেখি ঠাকুর, ছোঁড়াদের চাবিটা দিয়ে দাও তো।"

"চাবি ? চাবি কোথায় ? তোরা সব ক্ষেপে গেলি না কি লালা ?" অবিনাশ বাড়ুজ্জে খানিকটা এগিয়ে গেল সিন্দুকের দিকে।

"ঠাকুর, সব দিকেই তুমি জিতবে, আর আমরা কেবল গাধার মত বোঝা বয়ে বেড়াব, তা' কি হয় ? সিন্দুকটাকে টেনে আনতে মেহনৎ হয় নি ? চাবিটা ফেল দিকিন ঠাকুর।" গফুর তা'র হাতের বর্শাটাকে অবিনাশ বাড়ুজ্জের নাকের ডগায় তুলে ধরল।

"বর্শার ডগায় লাউ-ডগা সাপের বিষ লাগান আছে বাড়ুজ্জে মশাই।" করিম শেখ আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না।

রহিম বল্লে, "প্রায় দু' শ' বছরের টাকা এই সিন্দুকে ঘুমিয়ে আছে। এতটুকু সিন্দুকে অতগুলো রাজার মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে খুন বেরুচ্ছে না ঠাকুর ?"

অবিনাশ বাড়ুজ্জে জবাব দেয়, "ইংরেজই যখন চলে গেল, তখন তাদের রাজার মাথায় কি আর তা'রা রক্ত রেখে গেছে রে আহম্মক।"

গফুর মিঞা চেঁচিয়ে উঠল, "ও-সব রসের কথা পরে হবে। চাবির তোড়াটা ফেলে দাও, টাকাগুলোকে আবার অঙ্ক ক'ষে যোগ বিয়োগ ক'রে সমান ভাগ করতে রাত কাবার হ'বে।"

অবিনাশ বাড়ুজ্জে বল্লে, "তোদের কায়েদে আজমের কসম খেয়ে বলছি, ও-সিন্দুকের চাবি আমার নেই।"

"আমরা তা' হ'লে সিন্দুকটাকে ভেঙ্গেই ফেলি।"

করিম শেখ কুড়ুল দিয়ে বসিয়ে দিলে এক ঘা।

"আরে আরে করিস কি তোরা আহম্মকের দল—"

বাড়ুজ্জে যেন ওদের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। "অত মেহনৎ ক'রে সিন্দুক ভাঙ্গার দরকার কি। সিন্দুকটা তো খোলাই আছে। হাতল ধরে সামনের দিকে টেনে দে—।"

অবিনাশ বাড়ুজ্জের কথা শুনে, সবারই হাত গিয়ে পড়ল হাতলটার উপর। কে কার আগে হাতল ধরে টানবে। দরজা খোলার আর সবুর সইছে না। একটু জোরে টান দিতেই সিন্দুকের দরজা খুলে এল। ওপাশ থেকে করিম শেখ্, 'ইয়া আল্লা' ব'লে মাথা থেকে প্রায় পেটের নীচ অবধি ঢুকিয়ে দিল সিন্দুকের অভ্যন্তরে। সাপের বিষ মাখানো বর্শাটা অবিনাশ বাড়ুজ্জের হাতে দিয়ে, গফুরও চেষ্টা করতে লাগল, সিন্দুকের ভিতরে অন্ততঃ একটা হাত ঢোকানো যায় কিনা। লালামিঞা শেষ পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারল না। দু'শ বছরের সুদের টাকায় সিন্দুকের ভিতরে তো একটুও ফাঁক থাকবার কথা নয়। লালামিঞা সহসা অবিনাশ বাড়ুজ্জের হাতে পিস্তলটা গুঁজে দিয়ে, করিম শেখের পেছনের লুঙ্গি ধরে দিল টান। আলী বাবার মত, করিম

শেখ্ তখন দু'হাত দিয়ে সিন্দুকের মধ্যে একশ' টাকার নোটগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

অবিনাশ বাড়ুজ্জের তখন নজর পড়েছে ডান পাশের ঠাকুর ঘরের দিকে। তার পূর্ব্বপুরুষরা যেদিন প্রথম সুরাজপুরে এসেছিলেন, সে'দিন থেকেই সম্ভবতঃ এ বাড়ীতে 'নারায়ণ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবিনাশ বাড়ুজ্জের যতটা স্মরণে আসে, তার মনে পড়ে, এই 'নারায়ণ' সেবায় কেউ কোনদিন অবহেলা করে নি। নারায়ণের ভোগ না হ'তে, এ বাড়ীর কেউ জল-স্পর্শ করতে পারত না। বছরে একবার ক'রে এই নারায়ণ পূজায় সুরাজপুরের গরীব, ধনী, হিন্দু, মুসলমান সবাই ভোগে পেয়ে এসেছে। এ' নিয়মের ব্যতিক্রম কোন দিনই ঘটে নি। কিন্তু ১৫ই আগষ্ট, পাকিস্থানের প্রথম জন্মদিনে, এই নারায়ণ পূজোয় বাধা পড়ে। সে' ঘটনা অনাবশ্যক বলেই, এখানে লিখলুম না।

অবিনাশ বাড়ুজ্জে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে, ছোট্ট নারায়ণ-শিলা, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই পকেটে ভ'রে ফেল্ল। সে যখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে—তখন গফুর মিঞা চীৎকার ক'রে উঠল, "কি ঠাকুর, সিন্দুকে যে কিছুই নেই। পাকিস্থানে থাকবে, অথচ পয়সা জমা রাখবে কলকাতার ব্যাঙ্কে?"

গফুর আর করিম শেখ্ তখন এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আসছে। সামনেই পড়ে রয়েছে বিষ মাখানো বর্শা। গফুর কোন রকমে বর্শাটা হাতের মধ্যে টানতে পারলেই এই ব্যর্থতার জবাব দিতে পারে। অবিনাশ বাড়ুজ্জে সেকথা জানে। গফুর ফস্ ক'রে মাটি থেকে বর্শাটা তুলে ফেল্লো। সংগে সংগে অবিনাশ বাড়ুজ্জের পিস্তলের গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গফুর। সুরাজপুরের জমিদার সুচরিত বসুর বিশ্বাসী ভৃত্য গফুর মুন্সী বহুবার মহাল থেকে বহু টাকা আদায় ক'রে দিয়েছে। সুচরিত বসুর সংগে সে কোনদিন হিসেবের ভুল করে নি।

অস্ত্রহীন লালামিঞার দল মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য যেন একেবারে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একটা পিস্তলের সামনে অতগুলি প্রাণীর যেন কোন অস্তিত্বই রইল না। এতটা বাড়াবাড়ি আশা করে নি লালামিঞা। সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করল, "একি করলেন বাড়ুজ্জে মশাই ?"

লালামিঞা অবনিাশ বাড়ুজ্জের হাতটা চেপে ধরবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠল। অবিনাশ বাড়ুজ্জে হুঙ্কার দিয়ে বল্লো, "সাবধান লালা, ভুলে যাসনি, তোর পিস্তলে এখনো আরও পাঁচটা গুলি আছে। যদি দরকার হয়, আমি তোর বুকেও গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করব না।"

"সেই তো ভাল ছিল বাড়ুজ্জ্যে মশাই। আহা ছকু মুন্সীর একমাত্র ছেলে গফুরকে মেরে ফেল্লেন! বুড়ো বাপের কাছে গিয়ে জবাব দেব কি?" লালামিঞার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে কিন্তু বুকটাও যেন নিমেশের মধ্যে ব্যথার ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। সে স্পষ্ট অনুভব করল, ঐ পিস্তলের ধোঁয়ায় যেন দৈহিক ও মানসিক শক্তি সব লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

অবিনাশ বাড়ুজ্জে বল্লো, "ঘরের সিন্দুক বাইরে নিয়ে আসতে তোদের কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। অস্ত্রহীন অবিনাশ বাড়ুজ্জের নাকের ডগায় বর্শা ঠেকিয়ে রসিকতা করতে ছকু মুন্সীর একমাত্র সন্তান গফুরের হাজারবার ভাবা উচিত ছিল। পাকিস্থান পেয়েছিস ব'লে আমার নাকের ডগায় লাউ-ডোগা সাপের ন্যাজ্ দিয়ে সুড়সুড়ি দিবি, তেমন বাড়াবাড়ি না করলেও পারতিস। গলার জোরে চেঁচিয়ে বল্লি, পাকিস্থান জিন্দাবাদ, আসলে তো এসেছিলি লুট করতে।"

"বলি ঠাকুর মশাই অত যে লম্বা বুলি ছাড়ছ, সিন্দুকটা তো আগে থাকতেই খালি ক'রে রেখেছিলে। দু'শ বছর থেকে সুদ খেতে খেতে একেবারে ছকু মুন্সীর গায়ের চামড়া পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছ। সেইজন্যই যে গফুরের দল আজ প্রাণপনে চীৎকার ক'রে বলছে: পাকিস্থান জিন্দাবাদ। কিন্তু বেচারী গফুরটা যে মারা

গেল! তোমাদের সিন্দুকের চাপে গফুর-রা যেন না মরে, সেইজন্যই যে চীৎকার ক'রে আমিও বলি: পাকিস্থান জিন্দাবাদ।"

সংগে সংগে করিম শেখ ও রহিমভূইঞা চীৎকার ক'রে উঠল, "আল্লা-হো-আকবর।"

অবিনাশ বাড়ুজ্জে অনুভব করল যেন লালামিঞা আক্রমণের জন্য সুযোগ খুঁজছে।

অবিনাশ বাড়ুজ্জে আকাশের দিকে আর একটা গুলি ছুঁড়ল এবং সংগে সংগে সে পিছনের দিকে স'রে যেতে লাগল। লালামিঞা কি করবে? পাকিস্থান সীমান্ত রক্ষীদলের সেনাপতি আমাদের লালামিঞা অবিনাশ বাড়ুজ্জের হাতের দিকে চেয়ে বল্লো, "আমি আসছি আবার ঠাকুর মশাই।"

লালামিঞা আবার আসবে ব'লে অবিনাশ বাড়ুজ্জে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমন বোকা লোক সে নয়। মুহূর্ত্ত নষ্ট করা মানেই তার নিজের জীবন বিপন্ন করা। সুরাজপুরের সংগে তার যে যোগ সে যোগ তার ছিন্ন হ'য়ে গেছে। দেনা-পাওনার হিসেব সে চুকিয়েছে। সুদের কারবারের যা সে পেয়েছে সবই প্রায় সরিয়ে ফেলেছে কলকাতায় আর যা সে পেল না তার জন্য অবিনাশ বাড়ুজ্জের যেন বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। সুরাজপুর ত্যাগ করা সহজ কিন্তু সমস্তগ্রাম জুড়ে যে

স্বদের ফসল ফলিয়েছে সেই ফসল প্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই সহজ ছিল না। অর্থের নেশা যার প্রতি রক্ত বিন্দুতে উত্তাল হয়ে উঠত, সে কি ক'রে ত্যাগ করবে বাস্তুভিটে? কিন্তু গফুরের মৃত্যুর আকস্মিকতায় নেশা গেল কেটে—অবিনাশ বাড়ুজ্জে হন্ হন্ ক'রে ছুটে চল্লো স্বরাজপুরের সীমান্তের দিকে। সোজা রাস্তায় যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে, সে কায়স্থ-পাড়ায় ঢুকে পড়ল। সেখানে জন-মানব সে দেখতে পেল না। শুধু তিন চারখানা বাড়ী তখন পর্য্যন্ত দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। অবিনাশ বাড়ুজ্জের গায়ে যেন আগুনের তাপ লাগছে। সে লাফিয়ে পড়ল শ্রীকান্ত মিত্তিরের পুকুরের মধ্যে। পুকুরটা সাঁতরে যখন সে পার হ'য়ে গেছে, তখন সে শুনতে পেল, বামুনপাড়ার দিকে সেই পুরনো ধ্বনি, 'আল্লা-হো-আকবর।' শ্রীকান্ত মিত্তিরের পুকুর সাঁত্রে ওপারে উঠে সে ঢুকে পড়ল সনাতন ঘোষের বাড়ীর পেছন দিকে। সে-সব বাড়ীতেও কোন জন-মানব সে লক্ষ্য করল না। এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর ভেতর দিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত সে এসে দাঁড়াল সেই নর্দ্দমাটার ধারে, হিন্দুস্থান-পাকিস্থানের সীমান্ত। শ্রীকান্ত মিত্তিরের পুকুর সাঁতরাতে তা'র চার মিনিট লেগেছিল, কিন্তু পাকিস্থান সীমান্ত পার হ'তে তার এক সেকেণ্ডও লাগবে না। অবিনাশ বাড়ুজ্জে এবার একটু দম্ নিতে

পারে। পাকিস্থানে দাঁড়িয়ে দম্ নেয়া নিরাপদ নয় ভেবেই সে শেষ পর্য্যন্ত নর্দ্দমাটা লাফিয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পর সে শুনতে পেল, সেই ধ্বনিটা যেন ক্রমশই সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে। পাকিস্থানের এত সন্নিকটে দাঁড়িয়ে দম্ ফেলাও নিরাপদ নয় মনে ক'রে, সে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'লো, হাতে তা'র পিস্তল রয়েছে। হিন্দুস্থানের আইন আলাদা—শত্রুর হাত থেকে জীবন বাঁচাতে হ'লেও, বে-আইনী পিস্তল ব্যবহার করা চলবে না। সুতরাং অবিনাশ বাড়ুজ্জে পিস্তলটাকে নর্দ্দমার দিকে ফেলে দিল। জীবন বাঁচিয়ে, আইন বাঁচিয়ে শেষ পর্য্যন্ত, অবিনাশ বাড়ুজ্জে ফিরে এল কলকাতায়।

তারপর আমি কল্পনা করলুম যে বালিগঞ্জের বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে, হঠাৎ তার মনে পড়ল পকেটে রয়েছে, ঘুমন্ত নারায়ণ। ঘুমন্ত নারায়ণকে বুকে চেপে, অবিনাশ বাড়ুজ্জে চীৎকার ক'রে উঠল, "হিন্দুস্থান-জিন্দাবাদ।"

চীৎকার শুনে আন্নকালী ছুটে এল নীচে।

"কি হয়েছে বাবা—?" প্রশ্ন করে আন্নাকালী।

"বেঁচে গেছি মা।" উত্তর দেয় বাড়ুজ্জে মশাই। কিন্তু একটুপর জবাবটা সংশোধন ক'রে, অবিনাশ বাড়ুজ্জে বলে, "বেঁচে গেছিস, আন্নাকালী মা আমার।"

*   *   *   *

গফুরকে কাল কবর দেওয়া হ'ল। সমস্ত গ্রাম জুড়ে' যে কলরব উঠেছিল সে কলরবের ধ্বনি হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত পৌঁচেছিল কিনা বলতে পারি না। কিন্তু পাকিস্থান এলাকার আরও দশখানা গ্রামের অবশিষ্ট হিন্দু-পরিবার গোষ্ঠীর আতঙ্কের আর সীমা নেই।

অবিনাশ বাড়ুজ্জে পালিয়ে যাওয়ার পর, সমস্ত গ্রামের লোক অস্ত্র নিয়ে যখন ফিরে এল, তখন গফুর মারা গেছে। ডাক্তার কিংবা ওষুধের জন্য ওরা কেউ আর চেষ্টা করে নি।

চেষ্টা ক'রে কোন লাভ নেই, সে ওরা জানে। সুরাজপুরের যাঁরা ডাক্তার ছিলেন, তাঁরা সবাই হিন্দু। পনেরোই আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বেই তাঁরা নূতন চিকিৎসা-ক্ষেত্রের অন্বেষণে জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে হিন্দুস্থানে চলে গেছেন। হিন্দুস্থানে না গিয়েও উপায় ছিল না। অধুনা মুসলমানরা হিন্দু ডাক্তারের ওষুধের উপর আর তেমন নির্ভর করতে পারছিল না। যেমন পারছিল না, যুক্ত-ভারতে যুগ্ম-ধর্ম্মের শাসন পরিচালনায়। পনেরোই আগষ্টের পূর্ব্বে মহেন্দ্র ডাক্তারের একশিশি কুইনিন-মিকচার, ম্যালিরিয়া রোগীর কাছে অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু অধুনা ওরা ভাবছে পাকিস্থানের ম্যালিরিয়া, মহেন্দ্র ডাক্তারের কুইনিন-মিকচারে কোনদিনই সারতে পারে না।

পাকিস্থানে 'দাওয়াই' যদি না মিলল, রোগের কাছে আত্ম-সমর্পণ করাই ভাল। বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে যে যুক্ত-ভারতের কুইনিন-মিকচার, বিভক্ত ভারতের পাকিস্থান এলাকায় আর তেমন নির্ভরযোগ্য ওষুধ ব'লে গণ্য হচ্ছে না। ম্যালিরিয়ায় যদি মৃত্যু ঘটে, তা'তে কোন লজ্জা নেই—মহেন্দ্র ডাক্তারের কুইনিন-মিকচার খেয়ে যদি মরণ হয়, তবে পাকিস্থানের নাগরিক, কোন্ সুখে আর কবরের তলায় গিয়ে, শ্লোগান দেবেঃ লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান!

কিন্তু গফুরের যে মৃত্যু ঘটল সেটাও পাকিস্থান-লড়াই-র অংশ বিশেষ। এ' অঞ্চলের যতগুলো বড় সিন্দুক, তা'র প্রায় সবগুলোই তো দু'শ বছর থেকে হিন্দুর ঘরে ফুলে-ফেঁপে উঠছিল; গফুর লড়াই করেছিল, সেই কেন্দ্রীভূত অকেজো সম্পদগুনো, পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে।

সামরিক কায়দায় তাই গফুরকে কবর দে'য়া হ'লো। কবর যখন শেষ হ'লো, তখন সমবেত সামরিক জনতাকে উদ্দেশ্য ক'রে মহম্মদ উজবেক খাঁ বল্লেন, "দুর্ব্বলের প্রতি আঘাত করা ইস্‌লামের ধর্মশাস্ত্রে লেখা নেই। কিংবা ধর্মশাস্ত্রে যা লেখা নেই, মুসলমান তা' কখনও ক'রে না" কথাটা অসমাপ্ত রেখে, মহম্মদ উজবেক খাঁ, চোখ বন্ধ ক'রে একটু যেন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হয় তো কানপেতে

রইলেন, ঐ কবরের তলা থেকে, গফুর কোন শ্লোগান দিচ্ছে কিনা! শ্লোগানের জন্য গফুর মরতে পারে, কিন্তু মৃত গফুরের শ্লোগানের মূল্য কি? মহম্মদ উজবেক খাঁ তাই পুনরায় হুঙ্কার দিলেন, "গফুর গেছে, যাক্। কিন্তু একজন গফুরের ক্ষতিপূরণ ওরা কি দিয়ে করবে?"

'ওরা' মানে, সুরাজপুর ও আর দশখানা গ্রামের হিন্দু। নমশূদ্র পাড়ার নগেন মণ্ডল সেই সামরিক জনতার মাঝখান থেকে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, "হুজুর, যদি আদেশ দেন, তবে জিন্নাফণ্ডে আমরা চাঁদা তুলে দেব। শুধু হুকুম করেন, কত টাকা দিতে হবে।"

মহম্মদ উজবেক খাঁ সত্যিই তো আর উজবুক নয়। তিনি তাই বল্লেন, "মণ্ডলদের মধ্যে তুমিই তো আই-এ পাশ করেছ শুনেছি, চাঁদা তুলে গফুরের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করার মানেই হচ্ছে ডিপ্লোমাসী। কিন্তু আমি চাই, গফুরের পরিবর্ত্তে আরও দশজন গফুর। পাকিস্থানের টাকায় পাকিস্থানের ক্ষতিপূরণ হয় না।"

কবর আশ্রিত গফুর সম্ভবতঃ কেঁদে উঠল: হায় হায়, অবিনাশ বাড়ুজ্জের সিন্দুকটা যে একেবারে ফাঁকা!

নগেল মণ্ডল অসহায়ের মত জনতার দিকে চেয়ে রইল, আরে জনতা চেয়ে রইল নগেন মণ্ডলের মুখের দিকে উত্তরের অপেক্ষায়। শেষ পর্য্যন্ত নগেন মণ্ডল বল্ল, "হুজুর, আমরা তো স্বাধীন পাকিস্থানের নগন্য নাগরিক।

হুকুম শুনবার আগেই হুকুম তামিল করবার জন্য প্রস্তুত থাকি। আমাদের হুঁকোতে বাড়ুজ্জেরা তো তামাক খায় না, কিন্তু অবিনাশ বাড়ুজ্জেদের গুলির আঘাতে আমরা যে মারা যাই! আদেশ করুন হুজুর, শুধু দশ-জন নমশূদ্রের ধর্মান্তর গ্রহনে, পাকিস্থানের ক্ষতিপূরণ হবে তো?"

মহম্মদ উজবেক খাঁ জবাব দিলেন, "এখনকার মত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নগেন মণ্ডল, তোমরা এমন ক'রে পাকিস্থানে আর ক'দিন থাকবে? তোমরা তো শুধু হিন্দু সমাজের বাইরে নও, তাদের ছোঁয়া-ছুঁয়িরও বাইরে। একটু চাপ দিলে যদি কাজ হয় বল, তবে দু'চার দিনের মধ্যেই মণ্ডল পাড়ার ঘরে ঘরে নামাজের ব্যবস্থা করি। খরচ তেমন বেশী নয়, দু'চার টিন কেরাসিন তেল"—বাধা দিয়ে নগেন মণ্ডল বল্ল, "না না, সে সবের আর দরকার হবে না। করাচী কিংবা কলকাতা থেকে কেরাসিন তেল এ অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই আসে না। তেলের অভাবে অনেকের ঘরেই বাতি জ্বলে না, সে তো আজ প্রায় একমাস হলো। হুজুর যখন আদেশ দিলেন, তখন গফুরের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাই আগে করবার চেষ্টা করব।"

উজবেক খাঁ বল্লেন, "এ অঞ্চলে, আমি আর দিন সাতেক থাকব। নগেন মণ্ডলের যেন মনে থাকে যে সে

যা' আজ কবুল করে গেল, তার জন্য সাতদিন পর আমার আর সবুর সইবে না। মুসলমানের কাছে 'জবান্' মানেই জীবন। কেরাসিন্ তেলের অভাব বলেই, মণ্ডল পাড়ায় আগুন জ্বলবে না, এমন 'ষ্ট্রাটেজী' মুসলমানের সমর বিজ্ঞানে লেখা নেই।"

নগেন মণ্ডল বল্লো, "আজ্ঞে সে তো ঠিক। আপনাদের যুদ্ধ মানেই যুদ্ধ। আমাদের যুদ্ধ মানে ধর্ম-যুদ্ধ। কোন কারণে, আমাদের শত্রুপক্ষ যদি রণাঙ্গনে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তবে আমরা বুক দিয়ে কামানের মুখ ঠেকিয়ে রাখি —শত্রু যতক্ষণ না ঘুরে দাঁড়াবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যুদ্ধ করব না। সম্মুখ-যুদ্ধ ছাড়া, আমাদের সমর বিজ্ঞানে আর কিছু লেখা নেই হুজুর।"

নগেন মণ্ডল সমর বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল্, এই কথা ভেবে মহম্মদ উজবেক খাঁ কেমন সন্দিহান হ'য়ে উঠলেন। পাকিস্থানের হিন্দু নাগরিক সমর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করবে কেন? স্বাধীন পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী মজবুত হতে না হতেই, পঞ্চম বাহিনীরা যদি সমর-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা আরম্ভ ক'রে দেয়, তবে ভবিষ্যৎ পাকিস্থানের নিরাপত্তায় আশঙ্কা আছে। পাকিস্থানের সীমানা বৃদ্ধি করতে হবে বলেই পাকিস্থানে এত সামরিক আয়োজন ও সমর বিজ্ঞানের প্রয়োজন। সুচরিত বন্ধুর পক্ষে বালিগঞ্জের প্রাসাদে বসে, সমর বিজ্ঞান সম্বন্ধে

কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক নয় আর সম্ভবও নয়। গত দু' হাজার বছরে, ভারতবর্ষে কোটি কোটি মুসলমানের সৃষ্টি হ'য়েছে হিন্দুর রক্ত থেকে। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে, আদমসুমারীর ব্যবস্থা ছিল না বলেই সম্ভবত, আমরা দেখতে পাই নি এই সংখ্যা বৃদ্ধি। যাঁরা ভবিষ্যৎ দেখতে পান, তাঁদের আমরা বলি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তাঁরা কি জানতেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তলায় যা'রা পড়ে থাকবে তা'রা হবে অস্পৃস্ত—আর সেই অস্পৃস্তের রক্তে জন্ম নেবে অগণিত মুসলমান? হিন্দু সমাজের যাঁরা দ্রষ্টা, তাঁরা সম্ভব হাজার বছরের ভবিষ্যৎ দেখতে পান নি বলে আজ পূর্ব্ব-পাকিস্থানে সুরাজপুরের নগেন মণ্ডল মাথা নত ক'রে রইল উজবেক খাঁর দৃষ্টির সামনে। জবাব সে দিল বটে, কিন্তু সে জবাবের পিছনে কোনো নৈতিক সমর্থন রইল না! নীতির জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্যই নীতি। সেই জীবনই যদি না বাঁচল, তবে নগেন মণ্ডল চাইবে কোন্ দিকে? বালিগঞ্জের সুচরিত বসু কিংবা নয়াদিল্লীর অমুক নেতার উপর নগেন মণ্ডল নির্ভর করতে পারে কি?

মহম্মদ উজবেক খাঁ যখন সামরিক জনতা নিয়ে দবিরুদ্দীন সাহেবের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন তার নজরে পড়ল যে সুরাজপুরের সীমান্ত রক্ষী দলের সেনাপতি লালামিঞা সে জনতার মধ্যে উপস্থিত নেই।

মহম্মদ উজবেক খাঁ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন বটে, কিন্তু বসিরুদ্দীন তা'র কোন জবাব দিতে পারল না। লালা-মিঞার সংগে বসিরুদ্দীনের জীবন সংঘর্ষ অবিভক্ত ভারতবর্ষের আমল থেকেই চলে আসছে। কায়দে আজমের আদেশ মত মুসলমানের মধ্যে দলাদলি না থাকলেও বসিরুদ্দীন এখনও লালামিঞাকে ক্ষমা করতে পারে নি।

*　　*　　*　　*

সে রাত্তিরে মালতী পালিয়ে গেল। লালামিঞার সংগে তা'র কতটুকু পরিচয়! দু'চারটে কথা সে কয়েছে বটে, কিন্তু তাকে আলাপ বলা চলে না। মালতী যদি সীমান্ত অতিক্রম না ক'রে, উদয়দীঘির খালের দিকে পালিয়ে যেত, তবে লালামিঞার সংগে মালতীর দেখা হ'তো না, সে কথা ঠিক। লালামিঞার সংগে দেখা হ'তো না বটে, কিন্তু মালতীর পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'তো না। পাকিস্থান সীমান্তের দৃষ্টি এড়িয়ে হিন্দুস্থানের মালতী পালিয়ে যাবে, পাকিস্থানের ব্যবস্থা এত শিথিল নয়।

সে' রাত্তিরে, মালতী পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে লালামিঞা তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ তা'কে মনে রাখবার মতো, লালামিঞা মালতীর কাছ থেকে তেমন কিছুই পায় নি।

লালামিঞা সন্ধ্যের সময় বাড়ীতেই ছিল। সাংসারিক জীবনে, লালামিঞা একা। সাদি সে এখনো করে নি। কেন করে নি তা'রও কোন স্পষ্ট কারণ নেই। পয়সা তা'র যা' আছে, তা'তে দু'তিনটে জীবন তার অনায়াসে না চল্লেও, একটু আয়েস করলেই চলে যেতে পারত। তবুও কেন যে সে সাদি করে নি, আর কেন যে করছে না, সে কথা ভেবে লালামিঞা মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হ'য়ে যায়।

সুরাজপুরেই সে জন্মেছে আর সুরাজপুরেই সে বড় হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলে সে পড়েছে সত্যি কিন্তু লেখাপড়া আর পাঁচজন হিন্দুদের মত লালামিঞা শিখতে পারে নি। বাবা মারা যাওয়ার পর, লালামিঞা সংসারে একা পড়ল। চাষের কাজে মন দিতে হলো পুরোপুরিভাবে। যে-বছর নিজে লাঙ্গল ধরতে পারে নি, সে' বছর মজুর খাটিয়ে ফসল তুলেছে ঘরে। কারো কাছে সে ধার করে নি, নিজেও কারো কাছে ধারে ফসল বিক্রি করে নি' কখনো। জমিদারের খাজনা, নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে কাছারী বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এসেছে প্রতি বছর। হিন্দু জমিদারের খাজনা দে'য়া আজকাল মুসলমান প্রজারা তেমন প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করত না। প্রাগ্ পাকিস্থান যুগে এমনও দেখা গেছে যে জমিদারের সরকার খাজনা আদায় করতে এলে, প্রজারা বলেছে যে খাজনা

যদি দিতে হয়, তবে সে খাজনা দেবে তারা মুসলিম্-লীগ অফিসে। এ সম্বন্ধে কায়েদে অজমের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ কিছু না থাকলেও, তা'রা বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু জমিদারকে দু'চার কিস্তি খাজনা না দিলেও ঘর বাড়ী নীলামে উঠবার সাংঘাতিক কিছু আশঙ্কা নেই।

লালামিঞা পূর্ব্বপুরুষের নিয়ম রক্ষা করেছে। বাকী বকেয়ার ধার সে ধারত না। সুচরিত বসুর প্রজার তালিকায় লালামিঞার মতো এমন জমিদার বৎসল প্রজার আধিক্য থাকলে, কলকাতা জুড়ে তার আরও তিনটে প্রাসাদ তৈরি হ'তে পারত। বাকী বকেয়ার তাড়নায়, সুচারিত বসুর সে স্বপ্ন সার্থক হয় নি।

কিন্তু লালামিঞা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে মালতীর। অন্ধকার রাত্তিরে, নূরজাহানের রূপ সে ভাল ক'রে দেখতে পায় নি। যে-টুকু দেখেছে, তা'ই লালামিঞার পক্ষে যথেষ্ট। মুসলমান হ'য়ে মুসলমানের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে সে চীৎকার ক'রে বলে উঠেছে, "মালতী তুমি পালাও।" কেন সে বলতে গেল এমন কথা? আর নিজে যা'কে পালাতে সাহায্য করেছে, তা'র প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য লালা-মিঞা আজকের সন্ধ্যায় যেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

সীমান্তের পূর্ব্বদিকে একটা নাঠ ধূ ধূ করছে! প্রায় একমাইল রাস্তা হেঁটে গেলে, প্রথম পল্লীগ্রামের নাম রাজপুর। রাজপুরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। মুসলমানও আছে

নয়-দশ ঘর। মালতী কি রাজপুরে? লালামিঞা ইচ্ছে করলেই যেতে পারে রাজপুর। করিম শেখ্ রাজপুরের ধনী-কারবারী। গেল বছরও সে তা'র ফসল বিক্রি করেছে করিম শেখের কাছে। করিম শেখের বাড়ীতে লালামিঞা যদি দু'চার দিন গিয়ে থাকে, তবে মালতীর সংগে দেখা হওয়া অসম্ভব নয়।

সে রাত্তিরে মালতী চলে গেল সীমান্ত পেরিয়ে, কিন্তু সে ফেলে গেল একটুখানি স্মৃতি। এমন কিছু নয় —বোরকা নিয়ে মালতী পালায় নি। বোরকাটি সে ফেলে গেছে।

লালামিঞা আজকের সন্ধ্যায় সযত্নে রক্ষিত সেই বোরকাটাকে হাতে নিয়ে অনুভব করছিল, মালতী যদি আবার ফিরে আসে। বোরকা প'রে মালতী আবার নূরজাহান হবে, কিন্তু নূরজাহান হয়ে সে লালামিঞার জীবন ও জগৎ আলো ক'রে ব'সে থাকবে, এমন অঙ্গীকার সে পেয়েছে কি মালতীর কাছে? লালামিঞা ভাবে, মালতী যদি আর ফিরে না-ই আসে, না আসুক; কল্পনার নূরজাহানকে সে ঐ বোরকা পরিয়ে, জীবনের পথে হেঁটে যা'বে। বসিরুদ্দীনের দল যদি প্রশ্ন ক'রে "কে যায় ঐ?"

লালামিঞা তবে স্পষ্টগলায় জবাব দেবে, "আমি আর নূরজাহান।"

বাইরে থেকে এক্‌রামূল্লা জিজ্ঞাসা করল, "বাড়ী আছ মিঞা সাহেব ?" লালামিঞা যেন চমকে উঠল। স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যথায় স্বপ্ন রচনার আনন্দ আর মনে রইল না লালামিঞার। সে সযত্নে সরিয়ে রাখল বোরকা। লালামিঞার ঘরে এমন একটু নির্ভরযোগ্য গোপন আশ্রয় নেই, যেখানে বোরকাটাকে দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায়। ডানদিকের দেয়ালে একটা কুলুঙ্গি ছিল, লালামিঞা অনিচ্ছাসত্বেও, সেই অপরিচ্ছন্ন কুলুঙ্গির গহ্বরে সরিয়ে ফেল্ল বোরকাটাকে ! যেন বিস্মৃতির গহ্বরে মিলিয়ে গেল একটা আবেশজড়িত স্বপ্ন-রহস্য !

"ভেতরে এস। আস্‌সালামো-আলায়কুম্ !"

"ওয়ালায়কুম আস্‌সালাম্।" একরামুল্লা প্রবেশ করল ঘরে। একরামুল্লা ঘরের চারদিকে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, লালামিঞার এই সান্ধ্য-বিলাসিতায় কোন গোপনীয় তথ্য আবিষ্কার করা যায় কি না।

"তারপর খবর কি বল।" প্রশ্ন করে লালামিঞা।

"তোমার কাছেই খবর পা'ব বলে এসেছি মিঞা সাহেব। পাকিস্থানের দয়ায়, এ-রাজ্যের কাফের গুনো তো সব পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিঞা সাহেব, ঘরে যে আর চেরাগ জ্বলে না, দোকানে একরত্তি তেল নেই। শুনছি, দু'দিন পর এ' অঞ্চলের সব চালও নাকি সদরের দিকে চালান হ'য়ে যাবে। দিন-রাত্তির পাকিস্থানের

সীমান্ত রক্ষে করছ, তাই রাজপুর থেকে যে দু'মুঠো চাল নিয়ে আসব, তেমন সাহসও পাচ্ছি না।" এইটুকু বলে থেমে গেল এক্‌রামুল্লা।

লালামিঞা ক্ষণিকের জন্য কুলুঙ্গির দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলে, "সীমান্ত রক্ষার কাজ আমি করি বটে, কিন্তু মিঞা পেটের চাইতে কি আইন বড়? তোমার ঘরে যদি চাল না থাকে, তবে চলে যাও না রাজপুরের করিম শেখের বাড়ী। পাকিস্থানের চাল ফুরিয়ে গেলে, হিন্দুস্থানে গিয়ে চাল নিয়ে আসবে, তা'তে এমন দোষের কি আছে?"

"কিন্তু তোমার পাহারাটা একটু আলগা করো তা' হ'লে। ঘণ্টা খানিকের জন্য যদি তোমার ঐ ভলাণ্টিয়ারগুলো সরিয়ে নিতে পার, তবে সাহস ক'রে একবার রাজপুরের দিকে রওনা হ'য়ে যাই।"

লালামিঞা বল্ল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমি তো চব্বিশঘণ্টাই ঐ রাজপুরের দিকে চেয়ে আছি। নূরজাহান পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে, চোখে যে আর ঘুম নেই একরামুল্লা।"

একরামুল্লা জবাব দেয়, "সেই কথাই তো বলে বসিরুদ্দীন। এই মাঙ্গার বাজারে, নগদ দশটা টাকা খরচ ক'রে, ঐ মেয়েটার জন্য একটা বোরকা তৈরী করাল। যদি চলেই যাবি, তবে ঐ বোরকাটা রেখে গেলেই

পারতিস! হ্যাঁ ভাল কথা মিঞা সাহেব, জেলার খাঁ সাহেব তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছে। বসির মিঞা তো দিন-রাত্তির খাঁ সাহেবের পায়ে খুব তেল মালিশ করছে।”

লালামিঞা বল্ল, “সুরাজপুরে তেলের অভাবে পীরের দরগায় চেরাগ জ্বলে না, তবে বসির মিঞা এত তেল পায় কোথায়?”

“তা' বলব কি করে। রাজা-উজীরের ব্যাপারই আলাদা। সরষে গাছের গোড়া ধরে টান মারলেই, ফিন্‌কি দিয়ে তেল বেরয়। আমি বলি কি লালামিঞা, তুমি না হয় নিজেই একবার যাও না চলে, রাজপুরের করিম শেখের বাড়ী। তুমি যতক্ষণ না ফিরবে, তোমার হ'য়ে, সীমান্তের ঘাঁটি আগলে ব'সে থাকব আমি নিজেই।”

লালামিঞা স্বপ্ন দেখছিল মালতীর। স্বপ্নের রথে চ'ড়ে মানুষ চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে, পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে; সীমান্তের বিধি নিষেধ মেনে চলে না স্বপ্নের রথ। আর লালামিঞার রথেরই বা দরকার কি? ঐ তো একমাইল রাস্তা, লালামিঞা হেঁটেই চলে যেতে পারে।

একরামুল্লা বল্ল, “তোমার কোন ভয় নেই মিঞা সাহেব। অমাবস্যার রাতে, কে তোমায় দেখছে বল,

আর দেখলেও, কে তোমায় চিনবে বল। করিম শেখ যদি রাজী হ'য়ে যায়, তবে আমরা তো রাতের চালান দে'য়া চা'লে, দিনের আলোয় ছু' পয়সা রোজগারও করতে পারি মিঞা। লুটের কারবারে আর যে কোন মুনাফা নেই। বামুনপাড়ার সিন্দুকগুলো সবই তো খালি। পাকিস্থানের সীমান্ত পাহারা দিয়ে, কারবারি লোকের সুখ কোথায় বল ?"

সীমান্ত পাহারায় সুখ না থাকলেও স্বপ্ন আছে, সেকথা লালামিঞা জানে।······

গভীর নিশীথে লালামিঞা কদম্-কদম্ এগিয়ে যেতে লাগল হিন্দুস্থানের দিকে। নর্দ্দমাটার ওপারে কিছুদূর যাওয়ার পর, সে ছুটতে লাগল খুব দ্রুতবেগে।

তেপান্তরের রাজকন্যার জন্য যেন দূরান্তের রাজকুমার চলেছে জয়যাত্রায় !

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মহম্মদ উজবেক খাঁ তৈল মর্দ্দিত অবস্থায়, বসিরুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পুরনো বিবির খবর কি ?"

"আজ্ঞে কি বল্লেন হুজুর ?"

"জিজ্ঞাসা করছি, নোয়াখালির চালানি বিবির আগে ঘরে কি তোমার বিবি ছিল না ?"

তৈলাধারটাকে উপুড় ক'রে বসিরুদ্দীন তা'র হাতের চেটোয় সবটুকু তেলই ঢেলে ফেল্লো। তারপর, খাঁ

সাহেবের বিস্তৃত জানুদেশের উপর তেলটুকু সব লেপ্টে দিয়ে বসিরুদ্দীন বেশ জোরেই একটু চাপ দিল। খাঁ সাহেব চীৎকার ক'রে উঠলেন, "আর আরে, করিস কি? তুই কি তোর তাকত পরীক্ষা করছিস না কি? দরদে যে গায়ের চামড়া সব ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল।"

রাত্রির অন্ধকার যখন নামতে থাকে, তখন মহম্মদ উজবেক খাঁর কটি দেশ থেকেও একটা বাতের ব্যথা নেমে আসে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত। পাকিস্থান সীমান্ত রক্ষী-দলের বড়কর্ত্তাকে যদি কখনও, নৈশ অভিযানে মার্চ ক'রে এগিয়ে যেতে হয়, তবে সে অভিযানে মহম্মদ উজবেক খাঁর আর যোগ দেওয়া চলবে না। উজবেক খাঁর হিন্দুস্থান আক্রমণের সময় পরিকল্পনায়, নৈশ অভিযানের নির্দ্দেশ নেই। মাঠে ঘাটে, যেখানেই হোক, শিবির ফেলে, তাঁর জানু থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা আছে।

বসিরুদ্দীন বল্ল, "হুজুর, পুরনো বিবির দেমাক বড় বেশী ছিল। নোয়াখালি থেকে নূরজাহান আসবার পর সাকিনা বিবি এক সংগে ঘর করতে চাইল না। চলে গেল রাজপুরে তা'র ফুপুর বাড়ী। বলে গেল, গতর খাটিয়ে সে পয়সা রোজগার করবে। গতরে তা'র যে জোর আছে, সে জোরে সে মুটে মজুরের কাজ করতে পারে হুজুর।"

হুজুর বল্লেন, "গতরে জোর আছে ব'লে, তাকে হিন্দুস্থানে যেতে দিলি কেন ?"

"দু' দু'টো বিবি পুষবার মত পয়সা কোথায় হুজুর ?"

"পাকিস্থানে পয়সা নেই, একথা তোরা বলিস কি ক'রে ? আর পাকিস্থানে যদি পয়সা না থাকে, হিন্দুস্থান থেকে লুট ক'রে নিয়ে আয় ।"

এ সম্বন্ধেও উচ্চপদীয় নেতাদের কোন নির্দ্দেশ আছে কি না, সঠিক ক'রে বসিরুদ্দীন বুঝতে পারল না ।

"হুজুর যদি আদেশ দেন, তবে ধানের গোলা লুট করতে পারি । কিন্তু হিন্দুস্থানের সংগে যদি লড়াই বাধে ?" বসিরুদ্দীন প্রশ্ন করল ।

দু'টো রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত যখন টানা হ'য়েছে তখন হিন্দুস্থান এলাকায় গিয়ে ধানের গোলা লুট করায় সেই সাবেকি নির্ভরতা আছে কি না সে সম্বন্ধে বসিরুদ্দীন যেন সন্দিহান হ'য়ে উঠেছে ।

মহম্মদ উজবেক খাঁ কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের সুর মিশিয়ে বল্লেন, "আমাদের সংগে লড়াই করবে তেমন মুরদ আছে নাকি ওপারে ? বসির মিঞা, পাকিস্থানীর খুনে যদি আগুন লাগে, তবে ওপারের ঐ রাজপুরের ধানের গোলাগুলো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমন কথা ভাবিস কি ক'রে ?"

মুহূর্ত্ত কয়েক বসিরুদ্দীন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল। গ্রাম্য সরলতার বারুদ স্তূপের মধ্যে একটা ছোট্ট দেশলাই কাঠি দিয়ে আগুন লাগান যে কত সহজ কাজ, সে কথা মহম্মদ উজবেক খাঁ অনুভব করলেন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে।

উজবেক খাঁ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "নোয়াখালির বিবির সংগে বনিবনাও হয়েছিল তো মিঞা?"

বসিরুদ্দীন জবাব দিল, "হুজুর, খুব যে কিছু বনিবনাও হয়েছিল, তা' বলতে পারি না।"

"কেন? কি বলত সে?" জিজ্ঞাসা করলেন উজবেক খাঁ।

"যা বলত তার অদ্দেক কথাই বুঝতে পারতুম না। জবানে তার ইংরেজী বুলি আসত হুজুর। আমাদের মতো মুখ্যু ছিল না। সেদিন আমায় বল্ল যে মিঞা সাহেব একবার সদরে যাও দিকিন। ক'খানা কেতাব কিনে নিয়ে এস।" বসিরুদ্দীনের কথা শেষ না হ'তেই উজবেক খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, "গিয়েছিলি বুঝি সদরে?"

"গিয়েছিলাম হুজুর।"

"টাকা-পয়সা খরচ ক'রে, কিনে আনলি বুঝি কেতাব?"

"আজ্ঞে, কিছু টাকা খরচ হ'লো বৈকি। তু পাঁচমণ

ধান দিলুম বিক্রি করে—সেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এলুম ইংরেজী কেতাব।"

মহম্মদ উজবেক খাঁ বিস্মিত কণ্ঠে বল্লেন, "করলি তো আহাম্মকী? ধান-বেচা টাকায় কিনে ফেল্লি ইংরেজী কেতাব। বলি, মেয়েটা কি তোর ঘরে এসেছে কেতাব পড়তে?" মুহূর্ত্তের জন্য বসিরুদ্দীন কোন জবাব খুঁজে পেল না। সত্যিই তো হিন্দুস্থানের মালতী নূরজাহান হ'য়ে কেতাব পড়বে কেন।

কিন্তু একটু পরেই সে অনুভব করল যে জবাবটা ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। কেতাব পড়বে না তো, নূরজাহান করবে কি! সকাল বেলা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে মাঠের দিকে—সমস্তদিন ক্ষেত-খামারের কাজ করে ফিরে আসে সন্ধ্যের সময়। এই দীর্ঘ সময় যদি সে কেতাব পড়ে কাটায় তবে আর অন্যায় হলো কি।

শেষ পর্য্যন্ত সে বল্ল, "হুজুর, আমার ঘরে সে কেতাব পড়তে আসে নি বটে, কিন্তু কেতাব সে পড়ত ভাল। আমায় সে কেতাব পড়িয়ে শোনাত আর বলত যে মিঞা একটু-আধটু লেখা-পড়া জানা থাকলে, ক্ষেতের ফসল ফলবে ভাল। যে-জমিতে দশ মণ ধান জন্মায়, লেখা-পড়া জানা থাকলে, সেই জমিতেই পনেরো মণ জন্মানো যায়।"

"তুই বুঝি বিশ্বাস করলি?"

"বলেন কি হুজুর বিশ্বাস না ক'রে উপায় ছিল না। ইংরেজী কেতাবেই যে ও-সব লেখা আছে। কেতাব মিথ্যে হ'তে পারে হুজুর, কিন্তু নূরজাহান মিথ্যে বলবে না। শেষ পর্য্যন্ত আমি যে তার গোলাম হ'য়ে গেলুম, হুকুম তামিল ক'রে আর সময় পেতুম না। গেল বছরের দাঙ্গার সময়, ইস্‌কুল বাড়ী থেকে নিয়ে এলুম একটা চেয়ার আর টেবিল। বিবিজান্ সেই চেয়ারে ব'সেই কেতাব পড়ত।"

তৈল মর্দ্দিত জানুদেশকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়ে মহম্মদ উজবেক খাঁ বল্লেন, "অনেক বাড়াবাড়ি-ই করেছিলি দেখছি। লোহার শিকলে যা'কে বেঁধে রাখা উচিত ছিল, তাকে তুই কেতাব দিয়ে বসিয়ে দিলি কাঠের মসনদে!"

"আজ্ঞে মসনদ নয়, চেয়ার।" এমন সময় এল এক্‌রামুল্লা। সে বল্ল "হুজুর, গিয়েছিলাম লালমিঞার বাড়ী। দেখে এলাম লালামিঞার মন-মেজাজ ভাল নেই।"

"লালামিঞার মন-মেজাজ ভাল না থাকলে, পাকিস্থান চলবে কি করে? কিন্তু মন-মেজাজ ভাল নেই কেন?" প্রশ্ন করলেন উজবেক খাঁ। "পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলুম না। তবে সেই যে হিন্দু মেয়েটার ব্যাপার নিয়ে, লালামিঞার মেজাজ বিগড়েছে, সে কথা ঠিক।" "বসিরুদ্দীনের বিবির জন্য লালামিঞার মেজাজ বিগড়েছে

কেন? মেয়েটার সংগে লালামিঞার প্রেম-প্রণয় ছিল না কি?” খাঁ সাহেব নিজেই যেন অনাবশ্যক ভাবে কৌতূহলী হ’য়ে উঠলেন। দিনের বেলায় যে গুম্ফদেশ ইসলামী দর্পে উর্দ্ধমুখীন্ হয়ে থাকত, রাত্রি বেলায় ব্যথার প্রকোপে, সেটা ঝুলে পড়ত নীচের দিকে। উজবেক খাঁ সেই নিম্নমুখী গোঁফে চাড়া দিয়ে বল্লেন, “ব্যাপার কি একরামুল্লা? সেই মেয়েটা কি শুধু হিন্দুর মেয়েই ছিল, না সুন্দরীও ছিল?”

এ’বার জবাব দিল, বসিরুদ্দীন, “হুজুর, অমাবস্যার রাত্রিতেও মেয়েটাকে দেখলে চেনা যেত, হ্যাঁ নূরজাহানই বটে।”

একরামুল্লাও সংগে সংগে বল্ল, “সে কথা ঠিক হুজুর। রূপ দেখবার জন্য চেরাগের দরকার হ’তো না।” নিমেষের মধ্যে, মহম্মদ উজবেক খাঁ যেন সজীব ও বলিষ্ঠ হ’য়ে উঠলেন। দু’হাতের আঙ্গুল দিয়ে, গোঁফের প্রান্ত দেশ সবলে পীড়ন করতে লাগলেন। তৈল-মর্দ্দিত পা’ দু’টোও একটু নড়ে চ’ড়ে উঠল। তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠ্লেন “নূরজাহানকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।” বসিরুদ্দীনের হতাশ বুকে খানিকটা আশা ফিরে এল। সে বল্ল, “তা’ হ’লে যে আমি বেঁচে যাই হুজুর। সেই থেকে আমার অন্ধকার ঘরে যে আর চেরাগ জ্বলে না।”

উজবেক খাঁ বল্লেন, "যে-ঘরে চেরাগ জ্বলে, সে ঘরে নূরজাহান থাকে না। নূরজাহানের ঘরে বিজলী বাতি চাই।"

"পাকিস্থানে কি বিজলী-বাতি নেই হুজুর ?" বসিরুদ্দীন কৌতূহলী হ'য়ে উঠল।

"আছে রে আছে। সদরে আমার বাড়ীতেই আছে। যা' তো একরামুল্লা, ছুটে গিয়ে এক্ষুনি লালামিঞাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

"লালামিঞা সুরাজপুরে নেই হুজুর।"

"সুরাজপুরে নেই ? গেছে কোথায় ?"

"সে গেছে রাজপুরে নূরজাহানের খোঁজে।"

মহম্মদ উজবেক খাঁ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন। প্রচণ্ড একটা সামরিক উত্তেজনা তার বাত-ব্যাধি পীড়িত পা' দু'টোকেও চঞ্চল ক'রে তুলল। তিনি বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা বা'র ক'রে আদেশ দিলেন, "পাকিস্থানের ইজ্জৎ যদি তোমরা রাখতে চাও, তবে ছুটে যাও এক্ষুনি লালা-মিঞাকে ধরে নিয়ে এস। সীমান্ত যেটা টানা হয়েছে, সেটা বেশীদিন টিকবে না। আমরা জয় করব রাজপুর, আমরা কেড়ে নেব দিল্লীর মসনদ—আমরা উদ্ধার করব নূরজাহানকে। আল্লা-হো-আকবর।"

* * * *

গফুরের সামরিক কবর শেষ হওয়ার পর নগেন মণ্ডল নিজের বাড়ীতেই ফিরে এল। বাড়ী ফিরেই সে দেখতে

পেল, অস্পৃশ্য-হিন্দুদের সংগে দু' একজন পুরুত বামুনও তার জন্য অপেক্ষা করছে। সবারই চোখে মুখে সর্ব্বনাশের উৎকণ্ঠা। ইংরেজ আমলে, এমন উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা নিয়ে কেউ কখনো দিন কাটায় নি। নির্ভরতা এরা হারিয়েছে পনেরোই আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বেই। কিন্তু উক্ত তারিখের পর থেকে এরা হয়ে পড়েছে অভিভাবকশূন্য নাবালকের মত। যৌবনের বলিষ্ঠতা নেই প্রৌঢ়ত্বের বিচক্ষণতাও নেই। পৌরুষ যা' আছে, তা' চতুর্দ্দিকের অপরিমিত মুসলিম দর্পের উত্তাপে প্রায় পুড়ে ছাই হ'য়ে এল। সযত্নে সংগ্রহ করা একটা লাঠি নিয়ে যখন এরা লড়বে বলে ভাবছে, তখন চারদিকে দেখতে পাচ্ছে শত্রুর হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। নগেন মণ্ডল এই নিয়ে অনেক ভেবেছে। ঘরের মেয়েদের ডেকে বলেছে ঃ মরতে যদি হয়, তবে ওদের খানিকটা আঘাত দিয়েই মরব। কিন্তু তোমরা করবে কি ?

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর উত্তর আছে। একটা প্রমাণ সাইজের চুল্লী তৈরী করতে পারলেই মণ্ডলপাড়ার মেয়েদের পক্ষে জহরব্রত পালন করা অসম্ভব নয়। মুসলমানের অশ্বক্ষুরে, ভারতের মানচিত্রে দাগ পড়েছে অনেকবার কিন্তু একদা, ভারতভূমিতে যে সব চুল্লীর অগ্নি লীলায় লক্ষ লক্ষ নারী প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছে, তার শিখায় কি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ পৌরুষের কোন ইঙ্গিত ছিল না? গত

দু'শ বছরে সেই চুল্লীগুলো নিভে গেছে বলে যারা উন্মাদ মনোভাব নিয়ে বসে আছেন, তারা আজ মণ্ডলপাড়ার এই সভায় উপস্থিত নেই। কবর উৎক্ষিপ্ত কাঁচা মাটির উপর উজবেক খাঁর পদাঘাতে মণ্ডলপাড়ার সবগুলো গৃহ-ই যে ধূলিস্মাৎ হয়ে যেতে চায়! বামুনের মধ্যেও পুরুত বামুন থাকে। শঙ্কর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাই নগেন, কথা কইছ না যে? সাহস দাও তো থাকি—নইলে—"

"নইলে আর কি, সুরাজপুর ত্যাগ করবেন। এই ত?"

নগেন মণ্ডল ঘেমে উঠেছে অপরিমিত ভাবে। সে বুঝে উঠতে পারছে না, কার কাছে কেমন ক'রে সাহায্যের জন্য আবেদন করবে। সে ভাবছিল, কলকাতার খবরের কাগজ অফিসে সংবাদটা পাঠিয়ে দিলে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কি না। তার যতদূর মনে পড়ে, পাকিস্থানের সংখ্যা লঘুদের জন্য কলকাতার খবরের কাগজগুলোর সমবেদনা আছে। কিন্তু পাকিস্থানে বসে হিন্দুস্থানের সম্পাদকীয় সমবেদনার মূল্য কি? কংগ্রেস অফিস বন্ধ হয়ে গেছে—সেখানে যা'রা এতদিন অহিংস ভাবে বসবাস করছিল, তা'রা সব এক এক করে সুরাজপুর ত্যাগ করেছে। লোকের অভাবে কংগ্রেস অফিসের তালা খোলা হয় না। নির্ব্বাক নগেন মণ্ডল, অকর্মণ্য অসহায়ের মতো, সবার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইতে লাগল। নগেন মণ্ডলের অসহায়তা, হিন্দুর ঐতিহাসিক পরিচয় পত্র।

শেষ পর্য্যন্ত নগেন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, "জীবনের চাইতে ইজ্জৎ যদি বড় মনে কর, তবে, বাঁশের লাঠি কিংবা, ঝাঁটার কাঠি নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়'তে হবে। ঝাঁটার কাঠির আঘাতে শত্রুপক্ষ ঘায়েল হবে না জানি, কিন্তু একটা খোঁচা দিয়ে মরতে পারবে।"

কয়েক শতাব্দী পর, নগেন মণ্ডল মালকোঁচা দিয়ে, খড়কে হাতে, হলদিঘাটের পুনরাভিনয় করতে চায়। হল্‌দিঘাটে, প্রতাপসিংহের জীবন রক্ষা করেছে চৈতক—কিন্তু স্বরাজপুরে নগেন মণ্ডলের জীবন বাঁচাবার জন্য চৈতকের ভূমিকা গ্রহণ করবে কে? চৈতকের দায়িত্ব তো বড় কম নয়!

নগেন মণ্ডলের মনেও হলদিঘাটের স্মৃতি অস্পষ্ট নয়। তিরিশ ঘর মণ্ডলের চমকপ্রদ সমর প্রচেষ্টাকে পাকিস্থানী ফৌজ হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। সংঘর্ষের পূর্ব্বেই যুদ্ধের ফলাফল অজ্ঞাত থাকবে না। নগেন মণ্ডল ভাবল, ধর্মান্তর গ্রহণের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে, আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই।

এমন সময় এক অজ্ঞাত আগন্তুক এসে প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কি নগেন বাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম নগেন মণ্ডল। আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"আপাততঃ আসছি রাজপুর থেকে।"

সবাই যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্বস্তি অনুভব করল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের দল যেন অনেকটা বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠল।

আগন্তুক সবার দিকে একবার ক'রে চেয়ে নিয়ে, নগেন মণ্ডলকে বল্ল, "সব খবরই আমরা পেয়েছি। আপনাদের কোন ভয় নেই। ওরা যদি আক্রমণ করে, আমরা প্রতি আক্রমণ করব।"

আরেকটু হলেই নগেন মণ্ডল উন্মাদ হ'য়ে যেত। প্রতিরোধের যা'দের ক্ষমতা নেই, তারা প্রতি আক্রমণ করবে কি?

শঙ্কর ঠাকুর আগন্তুকের কথা শুনে প্রায় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। কাঁধের উপরে একটা গামছা ছিল, সেই গামছার এক কোণায় বাঁধা ছিল, পাথর দিয়ে গড়া ছোট্ট একটি শিব-লিঙ্গ। গামছার বিপরীত প্রান্তে সে বেঁধে এনেছিল সাংসারিক প্রয়োজনের দু' চারটে জিনিষ। যুবক আগন্তুকের প্রতিআক্রমণের কথা শুনে, শঙ্কর ঠাকুরের কাঁধের উপর থেকে দোদুল্যমান শিব-লিঙ্গ গামছা সমেত মাটিতে পড়ে গেল।

নগেন মণ্ডল শঙ্কর ঠাকুরকে অভয় দিয়ে বল্লো, "ভয় নেই ঠাকুর। বিনা যুদ্ধেই, আমরা ওদের সংগে জিতব। কিন্তু মশায়ের পরিচয়? আর প্রতি আক্রমণের ব্যবস্থাই বা কি?"

যুবক বল্ল, "পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, আমাদের কর্মকেন্দ্র উত্তর ভারতে, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ বলতে আমরা পুরনো মানচিত্রই বুঝি। আমি আপনাদের বলছি যে ভয়ের কোন কারণ নেই। মৃত্যু-বাণ না ছাড়লে, হিংস্র পশু মরবে কেন ?"

আগন্তুকের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আকস্মিক আগমন, দু'টোই ভারতইতিহাসের ব্যতিক্রম।

ঘরের ভিতর অসহায় আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটল। মৃত্যুবাণ কথাটা শুনে শঙ্কর ঠাকুরের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। হিন্দুর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে মৃত্যু বাণের অনেক বিস্ময়কর প্রয়োগের কথা সে পড়েছে। ছেলে বয়সের গল্প পড়ায় মৃত্যু-বাণের প্রতি বিশ্বাসের সীমা ছিল না। সে মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হ'য়েছে যে গত পাঁচ সাত বছরের মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামায়, সে সব মৃত্যু-বাণগুলো ব্যবহার করা হয় নি কেন। শঙ্কর ঠাকুর জানে না যে মহম্মদ ঘোরীর আমল থেকেই ভারতবর্ষে মৃত্যু-বাণ ব্যবহারের রীতি নেই। ধর্মগ্রন্থে কি মৃত্যুবাণ প্রস্তুতের প্রণালীর কথা উল্লেখ ছিল ?

শঙ্কর ঠাকুর পুনরায় বল্ল, "উত্তর ভারতের কারখানায় যখন মৃত্যু-বাণ প্রস্তুত হয়েছে তখন আর ভয় নেই। আমিতো বাড়ী থেকে দুর্গানাম জপ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলুম—উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্থান-মুলুকে আর থাকব

না। কিন্তু মশাই যখন, মৃত্যু-বাণ নিয়ে এসেছেন, তখন বাড়ীর দিকেই ফিরে যাই। কি বল হে নগেন মণ্ডল?” নগেন মণ্ডল কিছু বলবার আগেই শঙ্কর ঠাকুর দরজার দিকে পা বাড়াল। হটাৎ কি মনে করে সে পুনরায় আগন্তুক-কে প্রশ্ন করল, “দেখুন মশাই ছ’চারটে বেশী করে এনেছেন তো? এরা ‘সংখ্যায় কিন্তু রাবনের বংশকেও লজ্জা দেয়। একেবারে নির্মূল করতে হলে, ছ’চারটে মৃত্যু-বাণে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না। আচ্ছা, আচ্ছা নমস্কার। আশীর্ব্বাদ করছি, আপনাদের জয় হোক্।”

শঙ্কর ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর যুবকের সংগে নগেন মণ্ডলের অনেক আলাপ পরিচয় হ’লো। যুবকের কথায় উপস্থিত জন-নায়কদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে স্বরাজপুরের জন্য নর্দ্দমাটার ওপারের লোকরা আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ছ’চারটে নগেন মণ্ডল মরবার আগে, ছ’পাঁচশ’ উজবেক খাঁ মরবে।

শেষ পর্যন্ত যুবক এই বলে বিদায় নিল, “আপনাদের কাছেও ছ’চারটে অস্ত্র রেখে গেলাম। এ’সব অস্ত্র সরকারের পয়সায় কেনা হয় নি। পাঁচগুণ দাম দিয়ে আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। সুতরাং দেখবেন, মুসলমানদের আক্রমণের পূর্ব্বেই এগুলো যেন হারিয়ে না যায়। এসব বে-আইনী-অস্ত্র ব্যবহারে আপনারা

অভ্যস্ত নন বলেই হারিয়ে যাওয়ার ভয়। সময় বুঝে আমরা আসব। সঙ্কেতের ব্যবস্থা আছে, আমরা খবর পা'ব।" যুবক আর কোন কথা না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষন পর্য্যন্ত সবাই নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। হঠাৎ নগেন মণ্ডলের মনে হ'লো, এই পিস্তল ক'টা উঠোনের ঐ বাঁ দিকের গোয়াল ঘরে লুকিয়ে রাখাই নিরাপদ। সে প্রত্যেকের সম্মিলিত অভিমত নিয়ে, পিস্তলগুলো সরিয়ে ফেল্ল গোয়াল-ঘরে। তারপর সবাই মিলে বৈঠকখানার দাওয়ায় বসে ভবিষ্যৎ রণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা আরম্ভ করল।

বয়োজ্যেষ্ঠ গগন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, "রাখলে তো পিস্তল, ছুঁড়তে জান?" সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। কেউ সাহস ক'রে বলতে পারছে না যে পিস্তল তারা ছুঁড়তে জানে কিনা।

যুবক বিনোদ বিহারী বল্ল, "তা এমন শক্ত কাজ কি? ঘোড়াটা টিপলেই তো গুলি বেরুবে।"

"গুলি বেরুলেই কি লক্ষ্যভেদ হ'বে?" প্রশ্ন করে বয়োজ্যেষ্ঠ গগন মণ্ডল। সবাই যেন আবার এক নূতন সমস্যায় পড়ল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যা'রা খানিকটা নিরাপদ মনে করছিল, তা'রাই আবার আশাহীন হয়ে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত নগেন মণ্ডল বল্ল, "লক্ষ্যভেদের দরকার হ'বে

না। শুধু আওয়াজ বেরুলেই কাজ হ'বে। অবিনাশ ঠাকুরের বেলা তো দেখেছো।" এমন সময় তা'রা দেখল, মুন্সীপাড়ার রমজান আর লতিফ মিঞা উঠোনের ডান দিকের বাগান থেকে অনুমতির অপেক্ষা না রেখে, গাছ থেকে ফল পাড়ছে আর তা'রই অনুগত একদল মুসলমান ছেলে, সেগুলো সব বস্তা বন্দী করছে। আসছে রবিবার স্বরাজপুরে হাট বসবে।

"কি রে লতিফ, গাছগুলো যে সব ফাঁকা হয়ে গেল?" জিজ্ঞাসা করল নগেন মণ্ডল।

"আজ্ঞে ভালই তো হলো। দু'চারদিনের মধ্যে যদি হিন্দুস্থান থেকে এ অঞ্চলে কয়লা এসে না পৌছয়, তবে গাছগুলো সব কেটে নিয়ে যা'ব।"

"বলিস কি, আমার অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটবি?"

লতিফ মিঞা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

"কি. জবাব দিচ্ছিস না যে?"

"জবাবের আর আছে কি? পাকিস্থানের গাছ কাটব, তা'তে তোমার অনুমতি নেব কেন মণ্ডলের পো।" ইতিমধ্যে রমজান আলী নগেন মণ্ডলের গোয়াল-ঘরে ঢুকে পড়েছে। ছোঁড়ার দল একটা মই লাগিয়ে উঠে পড়েছে গোয়াল-ঘরের চালে।

গোয়াল-ঘরের ঢেউ খেলানো টিন ক'খানা রমজান আলী এক এক ক'রে খুলতে লাগল।

"এ সব কি হচ্ছে কি রমজান?" নগেন মণ্ডল নিরুপায় হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল। "কি আর হবে, তোমার এই টিন্ ক'খানা নিয়ে যাচ্ছি। আমার শোবার ঘরখানায় বৃষ্টির পানি পড়ত—সানুই বিবিকে সাদি করার পর, তু'দণ্ড কি আর ঘুমুতে পেরেছি ভাই! পেরেশানের আর সীমা ছিল না।"

উত্তর শুনে নগেন মণ্ডল হতবাক! রমজান আলীর পেরেশানের জন্য তার গোয়াল ঘরের টিন্ খোলা হচ্ছে!

নগেন মণ্ডল বল্ল, "তোরা দিনে তুপুরেই ডাকাতি করছিস।"

"ও কথা ব'লো না নগেন ভাই, ডাকাতি কেউ দিনে তুপুরে করে না। তোমার বাড়ী থেকে তু'চারখানা টিন্ নিয়ে যাব তার জন্য ডাকাতি করতে হবে কেন?"

সহসা নগেন মণ্ডলের মনে পড়ল যে গোয়াল ঘরের বিচালীর নীচে পিস্তল আছে। সে গিয়ে দাঁড়াল সেই পিস্তলের সন্নিকটে। নগেন মণ্ডলের সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে।

সে বল্ল, "রমজান, বিচালী নিয়ে যাবি না তো? যদি দরকার থাকে বল্, আমি নিজেই গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, আমার বিচালী দিয়ে কোন কাজ নেই।"

প্রায় একঘণ্টা পর রমজান আর লতিফের দল, প্রচুর সওদা ক'রে বেরিয়ে গেল নগেন মণ্ডলের বাড়ী থেকে। বয়োজ্যেষ্ঠ গগন মণ্ডল বল্ল, "অসহিষ্ণু হলে চলবে না নগেন। একটু চেপে-চুপে থাকতে হ'বে। অস্ত্র যখন আছে, তখন সময় বুঝে ব্যবহার করলেই চলবে। আঘাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে, আমরা প্রতিঘাত করব।"

* * * *

বসিরুদ্দীন দল নিয়ে পাকিস্থান সীমান্তে এসে ব'সে রইল। অন্ধকারে সে ঘুর ঘুর ক'রে সেই নর্দ্দমাটার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আজকে সে লালামিঞার উপর চরম প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ স্পৃহায়, সে টাট্টু-ঘোড়ার মত নর্দ্দমাটার এপার আর ওপারে লাফা-লাফি করছিল। আজকে সে সশস্ত্র হয়েই এসেছে। একেবারে জেলার বড়কর্ত্তা মহম্মদ উজবেক খাঁর স্ব-হস্তের পিস্তল সে পেয়েছে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে বটে, কিন্তু গুলি ক'রে মারবার আদেশ তো সে পায় নি! বসিরুদ্দীন ভরসা একেবারে ছাড়ে নি—যদি খোদার দয়ায়, লালামিঞা প্রতিরোধের চেষ্টা করে, যদি তার বুকে কোনক্রমে সে পুনরায় পিস্তল ঠেকাবার স্পর্দ্ধা করে, তবেই সে লালামিঞার বুকে চালিয়ে দেবে গুলি। আত্মরক্ষায়, প্রতিপক্ষের বিনাশ সাধনে কোন উপরওয়ালার আদেশের প্রয়োজন হয় না।

সে এসে একরামুল্লাকে জিজ্ঞাসা করল, "ঘুমিয়ে পড়লে নাকি মিঞা?" একরামুল্লা তখন, লালামিঞার জমি-সংলগ্ন একটা গাছের ডালে বসে, লালামিঞার আগমন প্রতীক্ষা করছে। এই গাছটাই পাকিস্থান সীমান্তের অবজারভেশন্ পোষ্ট।

"ডালে ব'সে কি আর ঘুম আসে মিঞা সাহেব! এখনো যে আসছে না।" একরামুল্লা জবাব দেয়।

"আসবে, আসবে।" বসিরুদ্দীন অর্দ্ধেক রাত্রির পরও, বিশ্বাস হারায় নি।

মধ্যরাত্রের আধফালি চাঁদ তখন পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়েছে। একরামুল্লাও গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। ঠাণ্ডা মৃদু বাতাসে একরামুল্লার চোখের পাতাও যেন বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়। বসিরুদ্দীনের দলের অন্যান্য লোক সীমান্তের চারদিকেই ছড়িয়ে আছে।

এমন সময় অনতিদূরে বসিরুদ্দীন শুনতে পেল, লালামিঞার কণ্ঠস্বর। লালামিঞার কণ্ঠস্বরের সংগে যেন ক্ষীণ অস্পষ্ট নারী-কণ্ঠেরও শব্দ এল। বসিরুদ্দীন সজাগ ও সতর্ক হ'য়ে উঠল। দু' একবার সে ধীরে ধীরে একরামুল্লাকে ডাকল। কিন্তু একরামুল্লা কোন জবাব দিল না। সম্ভবতঃ একরামুল্লা আর জেগে নেই। অবজারভেসন-পোষ্টে বসে একরামুল্লা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে।

নারীকণ্ঠের আওয়াজ যখন আরো একটু স্পষ্টতর হলো, বসিরুদ্দীনের রক্ত তখন পাঠান রক্তের কৌলিন্যে টগ্‌ বগ্‌ ক'রে ফুটছে।

বসিরুদ্দীন নর্দ্দমাটার বরাবর খানিকটা এগিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল, নাসিম আলীও খোলা মাঠের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সন্দেহ হলো, অন্য সবাই কেউ আর জেগে নেই। তাইতো, বসিরুদ্দীন নিজেই যে আজ পাকিস্থান সীমান্তের নিদ্রাহীন একক প্রহরী। এই একক প্রহরীত্বের উপর, বসিরুদ্দীনের তেমন যেন ভরসা ছিল না। বসিরুদ্দীনের সত্যিই ভয় করতে লাগল।

বসিরুদ্দীন স্পষ্ট দেখতে পেল, লালামিঞার সংগে বোরকাহীনা এক নারী। সে ভাবছিল, চীৎকার ক'রে উঠবে কি না। কিন্তু এই খোলা মাঠে চীৎকার করলেও যে সবাই জেগে উঠবে, তেমন বিশ্বাস তার ছিল না। চীৎকার করলেই নূরজাহান হয়তো আবার পালিয়ে যা'বে।

সহসা বসিরুদ্দীনের মনে হলো, ওরা যখন এসেই পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই লালামিঞা নূরজাহানকে নিয়ে নিজের ঘরেই ফিরে যাবে। ঘরে ফেরার পর, চারদিকে পাহারা মোতায়েন ক'রে, সে গিয়ে ঢুকবে লালামিঞার ঘরে। তারপর দু'জনকে একসংগে দড়ি দিয়ে বেঁধে

নিয়ে যাবে মহম্মদ উজবেক খাঁর বাড়ী। ওরা যখন ঘুমিয়ে আছে আর দু'চার মিনিট ওদের ঘুমুতে দে'য়া ভাল। এখন চীৎকার ক'রে উঠলে, নূরজাহান আবার পালিয়ে যেতে পারে। বসিরুদ্দীন নিজেকে গোপন করবার জন্য সেই নর্দ্দমাটার মধ্যে মাথা নীচু ক'রে বসে রইল।

একটুপর, বসিরুদ্দীন যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, ওরা দু'জন নর্দ্দমাটা ডিঙ্গিয়ে, হন্ হন্ ক'রে ছুটে যাচ্ছে। তারপর ওদের আর সে দেখতে পেল না। বসিরুদ্দীন আরেকটু অপেক্ষা ক'রে রইল আর মনে-মনে আন্দাজ করল যে এতক্ষণ ওরা নিশ্চয়ই বাড়ী পৌঁছে গেছে।

বসিরুদ্দীন এবায় নর্দ্দমাটার উপরে উঠে, ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অবজারভেশন-পোষ্টের তলায়। এদিকে ওদিকে সে দু' একবার চেয়ে দেখল, তারপর চীৎকার ক'রে উঠল, "আল্লা-হো-আকবর।"

একরামুল্লা অবজারভেশন্-পোষ্টের ডাল ভেঙ্গে, ছোট আরও দু' চারটে ডালের সংগে ধাক্কা খেয়ে এসে, শেষ পর্য্যন্ত গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। এরা সব এসেছিল, লালামিঞাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য!

তারপর একে একে সবাই এল। লালামিঞা ও নূরজাহানের সীমান্ত অতিক্রম ও অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে

বিশদভাবে আলোচনার পর, বসিরুদ্দীন চল্লো লালামিঞার বাড়ীর দিকে।

সে রাত্রে লালামিঞার বাড়ীতে ছলিমুদ্দী ছাড়া আর কেউ ছিল না। ছলিমুদ্দী দিন মজুর। লালামিঞার তিন বিঘে জমিতে সে বহুবার মজুরী খেটেছে। তা'র বাড়ী এখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ হ'বে। ছলিমুদ্দী প্রতি বছরই চাষ-বাসের সময় এই গ্রামে আসে আর লালামিঞার বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়। দিনের বেলায় মজুরী খেটে রাত্তিরে ছলিমুদ্দী খুব ঘুমিয়েছে।

বসিরুদ্দীনের অনেক ডাকাডাকির পর, ছলিমুদ্দীর ঘুম ভাঙ্গল। দরজা খুলে, ছলিমুদ্দী জিজ্ঞাসা করল, "কি গো মিঞা-সাহেবরা, এই রাত্তিরে এত হল্লা-চীৎকার কেন? কোন খবর নেই, এত্তেলা নেই, একেবারে কামান হাতে ঘরে ঢুকে পড়েছ?" বসিরুদ্দীন তার পিস্তলটা, লণ্ঠনের আলোর সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "লালা মিঞা কোথায়? তার সংগে যে এক বিবি সাহেব এল, সে-ই বা গেল কোথায়?" হাতের লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ছলিমুদ্দী অবাক হ'য়ে বল্ল, "পাকিস্থান পেয়েছ বলে তোমরা কি ভাবছ, দুনিয়াটা মগের মল্লুক? বলা নেই কওয়া নেই, কামানটা একেবারে আমার নাকের ডগায় তুলে ধরলে! বলি মিঞা সাহেবরা তোমরা

এইবার ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও—আমি দরজা বন্ধ করি। লালামিঞা তো পাকিস্থান সফরে বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি। আর বিবি টিবি তো কেউ নেই এখানে।"

চতুর্দ্দিকে খুব তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজাখুঁজি হল, কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গেল ঘরে। বসিরুদ্দীন আর একরামুল্লা পরামর্শ ক'রে ঠিক করল যে আজ রাত্তিরেই খাঁ সাহেবকে সব ঘটনা খুলে বলা ভাল। তারা গেল খাঁ সাহেবের কাছে।

ওরা দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে, মহম্মদ উজবেক খাঁর ঘরে বাতি দেখা যাচ্ছে। খাঁ সাহেব নিশ্চয়ই বসিরুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন। মহম্মদ উজবেক খাঁর চোখে আজ ঘুম নেই। লালামিঞা গেছে আজ রাজপুরে—সেখানে নূরজাহানের সংগে লালামিঞার হয়েছে সাক্ষাৎ পরিচয়। সীমান্ত রক্ষী দলের বড় কর্ত্তার উপরে টেক্কা দিয়ে লালামিঞা নূরজাহানের সংগে চালাচ্ছে প্রেমের কারবার। মহম্মদ উজবেক খাঁর চোখে আজ ঘুম নেই। বসিরুদ্দীনের চোখেও ঘুম ছিল না। পলাতকা নূরজাহান তিনটি প্রাণীর জীবনে আজ নিয়ে এসেছে অশান্তি—সংঘর্ষ অনিবার্য্য বলেই মহম্মদ উজবেক খাঁ লালামিঞার প্রতীক্ষায় এখনো ঘুমুতে পারেন নি।

প্রেমের রাজ্যে আজ তিন জনই যেন হ'য়ে উঠেছে সীমান্তের নির্ভিক প্রহরী।

বসিরুদ্দীন ঘরে ঢুকেই দেখে মহম্মদ উজবেক খাঁর সামনে নির্ব্বিকারভাবে ব'সে রয়েছে লালামিঞা। বসিরুদ্দীনের মনে হলো আকাশটা যেন ঘরের চাল শুদ্ধ তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে। ডান দিকের একটা আলাদা তক্তাপোশে ব'সে আছে সাকিনা বিবি।

এক্রামুল্লা বসিরুদ্দীনের পেছন থেকে এই দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে টুপ্ ক'রে নেমে এল রোয়াকের নীচে। এক পা' দু' পা' ক'রে সোজা স'রে পড়ল।

পূর্ব্ব বর্ণিত বাত ব্যাধির জন্য মহম্মদ উজবেক খাঁ সন্ধ্যার পর প্রায়শই হুঙ্কার দিয়ে কথা বলতে পারেন না। কিন্তু বসিরুদ্দীনকে দেখবামাত্র তিনি আহত ব্যাঘ্রের মতো ভঙ্গি ক'রে বল্লেন, "তোরা না সব মুখে বলিস যে তোদের গায়ে পাঠান রক্ত আছে ?"

বসিরুদ্দীন বল্লো, "হুজুর হুকুম করুন, প্রমাণ দিতে পারি।"

"প্রমাণের আর দরকার নেই। এ'বার সাকিনা বিবিকে নিয়ে ঘরে যা। একরামুল্লা গেল কোথায় ?"

বসিরুদ্দীন পেছন দিকে চেয়ে দেখল, একরামুল্লা সেখানে নেই।

"হুজুর সেও যে গিয়েছিল আমার সংগে। কিন্তু তা'কে যে দেখছি না হেথায়।" বসিরুদ্দীন যেন কেমন অপরাধী মনে করতে লাগল নিজেকে।

"গিয়েছিলি তো সীমান্ত? না, আদ্দেক রাত অব্দি ঘুমিয়ে এসে আমার কাছে খুব লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিচ্ছিস। এ'বার যদি সাকিনা বিবিকে ধরে রাখতে না পারিস তবে পাকিস্থানী ফৌজ থেকে তোর নাম কেটে দে'য়া হবে।" খাঁ সাহেব যেন মনে মনে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলেন এই ভেবে যে ঘরে যদি সাকিনা বিবি থাকে তবে নূরজাহান বিবির সে-ঘরে স্থান হবে না।

শেষ পর্য্যন্ত বসিরুদ্দীন সাকিনা বিবিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় সে লালামিঞার দিকে চেয়ে খাঁ সাহেবকে বল্লো, "হুজুর এই রইল আপনার পিস্তল।"

*　　*　　*

লালামিঞা রাজপুর পর্য্যন্ত আর পৌঁছতে পারে নি। রাজপুর গ্রামের কাছাকাছি যখন সে গেছে, তখন তার সংগে দেখা হলো সাকিনা বিবির।

সাকিনাবিবি বল্লো, "মিঞা সাহেব যাচ্ছ কোথায়? শিগগীর এখান থেকে স'রে পড়ো। একটু ফাঁকায় গিয়ে ইদিকের সব খপর বলব। প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, তবে ফিরে চলো।" কথাগুলো বলার সংগে সংগে সাকিনা বিবি যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল। তার

চোখের ইঙ্গিতে ও কথার ভঙ্গিতে যেন একটা রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের আশু সম্ভাবনা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা যদি থেকেই থাকে, তা'তে লালামিঞার কি? সে তো কোন রাষ্ট্রেরই কর্ণধার নয়—তিন বিঘে জমির ফলনের মধ্যে সে এযাবৎকাল জীবনের স্বপ্ন দেখেছে আর আজকে তা'র সেই তিন বিঘে জমিও নেই। জীবনে যদি স্বপ্ন না রইল তবে লালামিঞা বাঁচবে কি ক'রে?

তাই সে একটু দ্বিধা করল, সাকিনা বিবির কথা শুনেও মনে তার কোন ভয় হ'লো না। এতটা পথ অতিক্রম ক'রে এসে সত্যিই কি সে ফিরে যাবে?

সাকিনা বিবি পুনরায় সতর্ক করল, "কি মিঞা সাহেব, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চৌকিদারের গুলি খেয়ে যদি মরতে না চাও তবে এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।"

ফিরে এল লালামিঞা।

ফাঁকায় এসে সাকিনা বিবি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?"

"যাচ্ছিলাম করিম শেখের বাড়ী। গেল বছর পর্য্যন্ত সে-ই তো আমার মহাজন ছিল।" উত্তর দিল লালামিঞা।

"আমিও করিম শেখের কাছ থেকেই আসছি। সংগে একটা চিঠি দিয়েছে।"

"চিঠি কেন ? কিসের চিঠি ?"

"আরেকটু এগিয়ে গিয়ে, তোমায় সব বলছি চল।"

মিনিট পাঁচেক পর, যখন রাজপুরের গৃহস্থ বাড়ীর বাতিগুলো সব আবছা হয়ে এল, তখন সাকিনা বিবি বল্ল, "তোমাদের বড় মিঞার বড় বেগম নূরজাহান রাজপুরেই আছে জান তো ?"

"আমি কি করে জানব। এখান থেকে পালিয়ে গেছে, সে কথা আমি জানি।"

"সে যাওয়ার পর থেকেই, রাজপুরের হিন্দুরা বাইরে থেকে অনেক গোলা-গুলি নিয়ে এসেছে রাজপুরে। তা'রা নাকি কালীবাড়ী গিয়ে কসম্ খেয়েছে, এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। ঐ নূরজাহানের পায়ের কাছে বলি দেবে শ' খানিক মুসলমান। করিম শেখের আজ তিন রাত্তির থেকে চোখে ঘুম নেই। তা'র চিঠিতে সব লেখা আছে। বড় বেগম নূরজাহানের ধাক্কা এবার সামলাও।"

সাকিনা বিবি চুপ ক'রে রইল, লালামিঞার কথা শুনবার জন্য।

লালামিঞা বল্ল, "নূরজাহান পালিয়ে গেছে ব'লে তোমার আর দুঃখু কি বল। এইবার বড় মিঞা তোমার উপর থেকে আর চোখ সরাতে পারবে না। এ'তো তোমারই ভাল হ'লো সাকিনা বিবি।"

"ভাল হ'লো সে কথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্থান আর হিন্দুস্থানে যদি লড়াই বাধে তবে করিম শেখ যে জানে-প্রাণে মারা যাবে।"

কিন্তু লালামিঞা ভাবছিল, নূরজাহানের তবে কি হবে? নূরজাহানের কি হবে, সে প্রশ্নের উত্তর সাকিনা বিবি দিতে পারবে না মনে করেই লালামিঞা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি নিশ্চয় ক'রে বলতে পার যে নূরজাহান এখনো রাজপুরেই আছে?"

"হ্যাঁগো মিঞাসাহেব। এ যে আমার নিজ চক্ষেই দেখা। ঐ যে আরসাদ শিকদারের বাড়ীর ডানদিকে একটা বাতি দেখা যাচ্ছে ঐ বাড়ীতেই থাকে সে।" সাকিনা বিবি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নূরজাহানের বাড়ীর দূরত্বটা কতোখানি। সাকিনা বিবি যা' আঙ্গুল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল, লালামিঞা তাই মন দিয়ে বুঝে নে'য়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে লালামিঞা ঘুরে দাঁড়াল, আর যেন সে চলতে চাইছে না।

"কি গো মিঞা আর কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে এম্নি করে?" প্রশ্ন করল সাকিনা বিবি।

লালামিঞা জবাব দিল না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই সাকিনা বিবি লালামিঞার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর ওরা দু'জনে দেখতে পেল যে ঐ দূরের বাতিটা যেন নিভে গেল। সাকিনা বিবি এবার বল্লো,

"বাতি এবার নিভে গেছে। নূরজাহান সম্ভব ঘুমুতে গেল। আর দেরী ক'রে লাভ নেই।"

"হ্যাঁ, চলো এবার যাওয়া যাক।" লালামিঞা সীমান্তের দিকে হাঁটতে লাগল।

ওরা যখন সীমান্তের কাছাকাছি এসে পড়েছে, বসিরুদ্দীন তখন মাথা নীচু করে ব'সে আছে সেই নর্দ্দমাটার মধ্যে।

করিম শেখের লিখিত সমস্ত বিবরণ পাঠ করবার পর, মহম্মদ উজবেক খাঁ লালামিঞাকে বল্লেন, "নগেন মণ্ডলকে কাল সকালেই একবার খবর পাঠাবে। হিন্দুস্থানের গুপ্তচর যাওয়া-আসা করছে এ অঞ্চলে সে খবর সম্ভব তুমি রাখ না মিঞা ?"

লালামিঞা জবাব দিল, "সে খবর আমরা কি ক'রে রাখব বলুন।"

"কেন ?"

"গুপ্তচর তো গোপনভাবেই যাওয়া আসা করবে হুজুর।"

"তবে আর সীমান্তে ব'সে দিন রাত্তির করো কি শুনি ?"

"করার তো বিশেষ কিছু নেই, শুধু পাহারা দেই।" উত্তর দিল লালামিঞা।

মহম্মদ উজবেক খাঁ অর্দ্ধশায়িত ছিলেন, এবার তিনি উঠে বসলেন। তিনি চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন,

"পাকিস্থানের সীমান্ত যারা পাহারা দেয়, তারা যদি শুধু রাজপুরের দিকে চেয়ে থাকে আর স্বপ্ন দেখে নূরজাহানের তবে গুপ্তচরের সন্ধান রাখা সম্ভব হয় না। লালামিঞা, তুমি কালকেই একবার সদরে যাবে। কিছুদিনের জন্য তোমায় থাকতে হবে সদরে।"

"কিন্তু আমি তো হুজুর এখন যেতে পারব না সদরে।" লালামিঞার জবাবে কোন অস্পষ্টতা নেই।

খাঁ সাহেব হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা টানতে যাচ্ছিলেন। লালামিঞা চট্‌ ক'রে পিস্তলটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বল্লো, "হুজুর এবার ঘুমোতে যান। আমি বাইরে বসে রইলাম জোড়া পিস্তল হাতে। গুপ্তচরের যখন আনাগোনা সুরু হয়েছে তখন হুজুরকে আমি রাত জেগে পাহারা দেব।"

* * * *

সুচরিত, রাত আর কাটে না। প্রতি রাত্তিরে কেউ ঘুমোতে পারে না আক্রমণের আশঙ্কায়। খবরের কাগজের ঢেউগুলো হিন্দুস্থান থেকে সুরাজপুরের তট পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায়। হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা-রচনায় সবাই মুগ্ধ হয়, কিন্তু কারো মনেই শঙ্কাহীন নির্ভরতা আসে না।

খবর কাগজের ঢেউগুলো সুরাজপর-তটে ধাক্কা খেয়ে, মিশিয়ে যায় সহস্র বৎসরের সেই একই স্রোতাভিমুখে।

পাকিস্থানের প্রসারিত তটে কোন চিহ্ন থাকে না। রজনীর অলস মুহূর্ত্তগুলো, ত্ব' হাজার বছরের অভিশপ্ত হিন্দু-জীবনে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—ভারবাহী গরুর গাড়ীর মতো, মুহূর্ত্তের পথ অতিক্রম করতে যেন খরচ ক'রে বসে একটা যুগের হাজার যামিনী। না ঘুমিয়ে রাত্তিরে পথ-হাঁটা বড্ড কষ্টকর। কিন্তু এদিকের হিন্দু যারা সীমান্ত অতিক্রম ক'রে হিন্দুস্থানে সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করছে, তা'রা রাত্রির অন্ধকারেই যাওয়া-আসা করে।

এ' খবর মহম্মদ উজবেক খাঁ জানেন। সীমান্তের লম্বমান আঁকা-বাঁকা নর্দ্দমাটার সম্মান রক্ষা করতে পারছে না পাকিস্থানের প্রহরী। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে হিন্দু জনতার সামনে খানিকটা সামরিক কুচ-কাওয়াজ না করলে, এরা পাকিস্থানের আগ্নেয়াস্ত্র ও আগুনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। সামরিক কুচ-কাওয়াজের পূর্ব্বে একটা কেল্লা সৃষ্টির প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। তার নাম হয়েছে পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লা। মহম্মদ উজবেক খাঁর কেল্লা সৃষ্টির ফলাফল দেখে মনে হলো কেল্লার রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নেই।

সীমান্তের অনতিদূরে কেল্লা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। গগন মণ্ডলের জমি থেকে মাটি কেটে নিয়ে

এল দিন মজুরের দল, তাই দিয়ে তৈরী হলো দশ ফুট চওড়া আর কুড়ি ফুট লম্বা পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লার ভিৎ। সেই ভিতের উপর ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলে উঁচু করা হ'লো প্রায় তিন ফুট। তিন ফুটের পর দেয়াল হ'লো ঝাটি-মাটির। উপরে ঢেউ খেলানো টিন্। এই টিন্গুলো ওরা নিয়ে এসেছে সুচরিত বন্ধুর দপ্তরখানার চাল থেকে।

বর্ণ-হিন্দু আর অস্পৃশ্য হিন্দুর মাল-মশলা দিয়ে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লার নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হলো। বেড়ার গায়ে টাঙ্গিয়ে দিল কাগজের সাইনবোড। সাইনবোর্ডে লেখা রইল, পূর্ব্ব-পকিস্থান কেল্লা। বর্ষার প্রথম বারিপাতে এ সাইনবোর্ড যে টিকবে না, সে কথা হলপ ক'রে বলা চলে।

* * * *

মহম্মদ উজবেক খাঁ সে'দিন এই কেল্লার উদ্বোধন করলেন। বাঁশের ডগায় উড়িয়ে দিলেন পাকিস্থানের পতাকা। পতাকার রং সমন্বয়, করাচীর আদেশ মত হয় নি। কিন্তু ওদের আর উপায় ছিল না। সুরাজপুরে পতাকা উপযোগী বিলেতি পাকা রং ওরা পায় নি। যা' পাওয়া গেল, সেটাও কোন রং বিশারদ ডাইং-মাষ্টারের হাতে পড়লে, হয়তো বা করাচীর পতাকার মত দেখতে হ'তো, কিন্তু উপস্থিত সুরাজপুরে তেমন কোন বিশারদকে পাওয়া গেল না।

পতাকা উত্তোলনের সময় মহম্মদ উজবেক খাঁ লক্ষ্য করলেন যে পাকিস্থানের পতাকার রং ওরা বিলকুল অদল বদল করেছে।

এ যেন কোন্ অজ্ঞাত দেশের অচেনা পতাকা!

কিন্তু মহম্মদ উজবেক খাঁ ভাবলেন যে পতাকা বাঁশের ডগায় উত্তোলিত হওয়ার পর, এ সম্বন্ধে আর কিছু না ভাবাই ভাল।

পতাকার কাপড়টা তো ভাল। একেবারে বিলেতী পপ্‌লিন। কলকাতার কোন মাড়োয়ারীর দোকান থেকে লুণ্ঠিত পপ্‌লিন, কত না বাণিজ্য-তরীর সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এসে পড়েছে সুরাজপুরে।

গুম্ফদেশ মর্দ্দনের পর, মহম্মদ উজবেক খাঁ বল্লেন, "জানের চাইতে ঝাণ্ডা বড়। এই ঝাণ্ডার জন্য দুনিয়া জয় করতে পারি আমরা।"

প্রায় দশ হাজার সামরিক ও বে-সামরিক জনতা যেন শিকলে বাঁধা ব্লাড্-হাউণ্ডের মতো ছট্‌ফট্ করছিল।

শীকার তো সামনেই রয়েছে—শিকলটা খুলে দিলেই হয়। কিন্তু মহম্মদ উজবেক খাঁ সময় ও সুযোগ বুঝে শিকল খুলবেন, সে কথা পাকিস্থানী জনতা সেই মুহূর্ত্তে বুঝতে পারল না।

সভার মধ্যে বসিরুদ্দীন একটা মরচে পড়া আধভাঙ্গা তলোয়ার জনতার মাথার উপরে তুলে ধরে চীৎকার ক'রে

বলে উঠল, "হুজুর শুধু হুকুম করুন। বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে, গাধার বাচ্চাগুলোকে টুক্‌রো টুক্‌রো করি।"

মহম্মদ উজবেক খাঁ ভাবলেন যে আধখানা তলোয়ার দিয়ে গাধার মতো অহিংস জানোয়ারকে খোঁচা দে'য়া চলবে, টুক্‌রো করা চলবে না।

উজবেক খাঁ পুনরায় বল্লেন, "তোমরা আমার হুকুম পা'বে। আমায় শুধু জবান্ দিয়ে যাও যে পাকিস্থানের জন্য জান্ দিতে কসুর করবে না।"

"কভি নেই, কভি নেই।" জনতা জবাব দিল।

মহম্মদ উজবেক খাঁ প্রায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। প্রাচীন কালে যদি আধুনিক যুগের মতো সংবাদিকের রিপোর্ট লিখবার রীতি থাকত, তবে দেখা যেত যে গজনীর মামুদ ভারতবর্ষে পদার্পণের প্রাক্কালে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার সংগে আজকের খাঁ সাহেবের বক্তৃতায় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। দুর্ব্বলের হাতে শাসন দণ্ড কোন দিনই মর্য্যাদা পায় নি—বৃদ্ধ যদি অর্দ্ধস্খলিত দন্তরাজির মহিমায় গর্ব্ব অনুভব করে, তবে যুগ যুগ ধ'রে মামুদ কিংবা মহম্মদ উজবেক খাঁ পাশে দাঁড়িয়ে তামাসা উপভোগ করবে, তেমন আশা করা বাতুলতা বৈ তো নয়।

পূর্ব্বপুরুষদের বার্দ্ধক্যের আজও অবসান ঘটেনি—বার্দ্ধক্যের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যায় তোমাদের দুর্ব্বলতাগুলো হয়েছে চিরস্থায়ী। তাই জন্মের প্রথম দিনেই সুচরিত বসুরা বার্দ্ধক্যের জয়গানে আত্মার মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। দুর্ব্বলের আত্মা সবলের তরবারির নীচে কোন্ মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে, বলতে পার ?

সভাশেষে মহম্মদ উজবেক খাঁ পাঁচ-মিশালি সৈন্যদের আদেশ দিলেন, "ফল্-ইন্।" ভাঙ্গা চিরুণীর মতো লম্বাভাবে দাঁড়িয়ে গেল পাকিস্থানী ফৌজ। কারো হাতে রাইফেল, কারো হাতে বাঁশের লাঠি, আর বসিরুদ্দীনের হাতে কোষমুক্ত ভাঙ্গা তলোয়ার। যা'রা ভাগ্যবান, তারা কেউ কেউ দেহ আবৃত করেছে গেঞ্জি, গামছা ও কোর্ত্তায় আর ভাগ্যহীনেরা নগ্ন দেহে বাঁশের লাঠি নিয়ে 'ফল্-ইন্' করেছে। জনতার মাঝে নগেন মণ্ডল দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে যদি তেত্রিশ কোটি দেবতার অসীম কৃপায় পাকিস্থানে একটা আভ্যন্তরিক বিপ্লব বাধে তা'হলে সে গিয়ে পক্ষ নেবে ঐ এক ডজন রাইফেল-ধারী সৈনিকের। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন পুণ্য ভারতভূমি খণ্ডিত হয়েছে, তখন দেবতারা নিশ্চয়ই আর পাকিস্থানের আভ্যন্তরিক বিপ্লবের জন্য মাথা ঘামাচ্ছেন না। আশা করা যায় যতক্ষণ তাঁরা এই নিয়ে সময় নষ্ট করবেন, ততক্ষণ তাঁরা পশ্চিম পাকিস্থানের উৎকৃষ্ট তুলোয়

ব'সে ব'সে চরকা কাটবেন। নগেন মণ্ডলের নিজের কোন চরকা নেই বলে, সে পরের চরকায় তেল মাখাবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে।

মহম্মন উজবেক খাঁ বসিরুদ্দীনকে ডেকে আদেশ দিলেন যে সে যেন এই ফৌজ নিয়ে মণ্ডল পাড়ার ভিতর দিয়ে সশব্দে মার্চ ক'রে যায়।' বসিরুদ্দীন সামরিক কায়দায় সেলাম ক'রে বল্ল, "জী হুজুর।"

*　　*　　*　　*

সুচরিত, তুমি বোধ হয় জান যে আমার পুত্র, অর্থাৎ একমাত্র পুত্র শ্রীমান জগদীশচন্দ্র পাটনায় সরকারী দপ্তরে চাকরী করে। স্ত্রী মারা গেছেন, সে আজ দশ বছর হলো। সুরাজপুরের মাটিতে তাই আমার কোন পলিটিকাল দাবী না থাকলেও, আকর্ষণ আছে। ধন-সম্পত্তি আমার কিছু নেই—অনুমান করছি যে বসিরুদ্দীনের দল সেইজন্যই আমার এই পৈতৃক-সম্পত্তির জীর্ণ-কুটারের উপর দৃষ্টি দেয়নি। কাফেরের রক্তের জন্য ওদের ঐতিহাসিক লোলুপতার সীমা নেই--কিন্তু আমার মতো একজন বৃদ্ধের শুষ্ক-শিরার রক্তের স্বল্পতায় ওরা কতটুকুই বা পাবে, আর আমি কতটুকুই বা দিতে পারি!

শ্রীমান জগদীশচন্দ্রের মাসিক তিরিশটি টাকার উপর আমার তিরিশ দিনের আয়-ব্যয় নির্ভর করে। পাটনার পোষ্ট অফিস থেকে এই তিরিশটি টাকা এ' যাবতকাল

মনিঅর্ডার যোগে আমার কাছে আসছিল। গত ছু'মাস সেই মনিঅর্ডারের কাগজ ছু'খানা সুরাজপুর পোষ্ট অফিসে এসেছে ব'লে সঠিক খবর পেয়েছি কিন্তু টাকা এখনো বিলি হয়নি। আমার মতো অনেকেরই, পোষ্ট অফিসের উপর সেই অভিযোগ আছে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, সবারই মাসিক বরাদ্দের ভাগ্য সুরাজপুরের পোষ্ট-অফিসের জালে জড়িয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, পোষ্ট-অফিসে টাকা নেই।

তৃতীয় মাসে শ্রীমান জগদীশচন্দ্র টাকা পাঠিয়েছে, রাজপুরে তার মেসোর কাছে। তাই ঠিক করেছি রাজপুর গিয়ে টাকা ক'টা নিয়ে আসব।

লালামিঞাকে বল্লুম, "ছু' চারদিনের মধ্যেই এসে যা'ব। কুটুমবাড়ী যাচ্ছি। উপরওয়ালার আদেশের যদি দরকার হয়, তবে দয়া ক'রে সে ব্যবস্থাটুকু তোমাকেই ক'রে দিতে হ'বে।"

লালামিঞা বল্ল, "দাদাঠাকুর, ছু' মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে কষ্ট হ'বে না? চিঠি দিন, আমি নিজেই না হয় যা'ব। তিরিশ টাকার মামলায় আমি আসামী হ'য়ে ফিরে আসব না।"

"না না, সে কি কথা লালামিঞা! অবিশ্বাস তোমায় আমি করছি না। কুটুমবাড়ী গিয়ে ছু' চারটে দিন থাকব বলে, ঠিক করেছি।"

"তা' হলে যা'বেন চলে সীমান্ত পেরিয়ে। আমি থাকব সেখানে। উপরওয়াল্লার অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর সুরাজপুরের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর গায়ে হাত দেবে, এমন মুরদ কোন্ মিঞার দাদাঠাকুর? তোমরা হয়তো ভাবছ, পাকিস্থানে এ'সব হচ্ছে কি। কিন্তু আমি বলছি কি, আল্লার কৃপায় সব ঠিক হ'য়ে যা'বে।"

লালামিঞার দয়ায় সত্যি একদিন পাকিস্থান সীমান্ত পার হ'য়ে হিন্দুস্থান এলাকায় এসে পড়লুম। কিছুক্ষণ পর, হিন্দুস্থানের মাটির উপর দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছি, আর নজর দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছি যে দু'টো দেশের মাটিতেও কোন বিভিন্নতা এসেছে কি না।

হিন্দুস্থান এলাকায় প্রায় এক মাইল রাস্তা হেঁটে এলুম। লক্ষ্য করলুম এ'বছর এ'সব অঞ্চলে কেউ আর ফসল লাগাবার ব্যবস্থা করেনি। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। পাকিস্থান সীমান্তের এত নিকট সান্নিধ্যে হিন্দুর ফসল হয়তো ফলবে, কিন্তু ফলের পুরোপুরি অংশই যে পাকিস্থানের লোক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সে' সম্বন্ধে হিন্দু-চাষীর আর কোন সন্দেহ নেই। খবর পেয়েছিলাম, হিন্দু-চাষীরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আবেদন করেছিল যে মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি মাঠের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন করেন, তবে সীমান্ত-সংলগ্ন জমিগুলোতে তারা ফসল লাগাবার চেষ্টা করতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভেবে-চিন্তে দেখলেন যে, পুলিশ মোতায়েন ক'রে মাঠচাষের ব্যবস্থা করলে পাকিস্থানের সংগে একটা বড় রকমের বিরোধ বাধবার আশংকা আছে। যেখানে আশংকা আছে সেখানে সরকার বাহাদুরের বাহাদুরি করা ঠিক নয়।

হিন্দু এলাকায় এসে সরকার বাহাদুর ও হিন্দু-চাষীর দুর্ব্বল চিত্তের প্রথম চিহ্ন দেখতে পেলুম, এই এক মাইলব্যাপী জমিগুলোর বৈধব্য পরিবেশের মধ্যে।

শ্রীমান জগদীশচন্দ্রের মেসো অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি। স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র-পরিবার পরিবেষ্টিত হ'য়ে, দিনের বেলাটা কাটান হুঁকো হাতে—রাত্রিবেলা শয্যাগ্রহণ করেন কুইনিন মিকচারের বোতল হাতে। জ্বরের উত্তাপের ওঠা-নামার উপরে, তা'র মেজাজের উত্তাপ নির্ভর করে। তিনি বল্লেন, "বর্ষাকালটা, এ' অঞ্চলে সব চাইতে খারাপ সেতো তুমি জান। ম্যালিরিয়ার প্রকোপ এই সময়টায় বৃদ্ধি পায়।"

বল্লুম, "মুখুজ্জে মশাই, আমি তো দেখে আসছি এ অঞ্চলের ম্যালিরিয়া ঋতুর হিসেব করে আসে না।"

মুখুজ্জে মশাই বল্লেন, "সেকথা ঠিক। আমাদের সময় ম্যালিরিয়ার জন্য একটা আলাদা সিজিন্ ছিল। এখন তো দেখছি কোন কিছু নিয়ম মেনে চলে না।

শীতকালই বলো আর বসন্তকালই বলো, ম্যালিরিয়ার মরণ-কামড় সব সময়েই চলছে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন এমন হ'লো মুখুজ্জে মশাই? একটা গোটাজাতির মেরুদণ্ড যে ব্যাধিতে এমন ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে তার বিহিত কি কোনকালে কোন লোকের দ্বারাই হবে না? আমেরিকা থেকে যখন ময়দা নিয়ে আসতে পারছি তখন সেই সংগে গোটাকয়েক বৈজ্ঞানিক নিয়ে এলে কেমন হয়? একেবারে গোড়ায় আঘাত করতে না পারলে, শুধু কুইনিন মিকচারের উপর নির্ভর ক'রে থাকলে চলবে কেন মুখুজ্জে মশাই? স্বাধীন-রাষ্ট্রের নাগরিক যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যদি বন্দুক ফেলে দিয়ে মিকচারের শিশি নিয়ে মেতে ওঠে, তবে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় নাকি?"

মুখুজ্জে মশাই বল্লেন, "মন্দ বলো নি ভায়া। বন্দুক ফেলে দিয়ে কুইনিন মিকচারের বোতলে অপরপক্ষের সৈনিকের মাথা ফাটিয়ে দে'য়ার মধ্যে বীরত্ব আছে বৈকি! কিন্তু এইসব জাতীয় দুর্গতির মূলের খবর রাখ কি?"

বল্লুম, "ঠিক যে রাখি বলতে পারি না। আপনি বলুন না, শুনি।"

মুখুজ্জে মশাই গম্ভীরভাবে বল্লেন, "আমাদের সংসার থেকে ধর্ম্ম লোপ পেয়েছে। অতীত বাংলার সোনার ইতিহাস তাই আজ রূপকথায় দাঁড়িয়েছে। সে সব

ইতিহাস এ কালের ছোঁড়ারা আর পাবে কোথায় বল ?”

জিজ্ঞাসা করলুম, “সে সব সোনার ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো গেল কোথায় মুখুজ্জে মশাই ? দু’ চারটে ছেঁড়া পাতাও কি সংগ্রহ করা যায় না ?”

মুখুজ্জে মশাই যেন গানের সুরে জবাব দিলেন, “সে কি আর আছে রে দাদা ?” না থাকবারই কথা বটে। ইতিহাসের সোনার পৃষ্ঠাগুলোয় মুসলমানদের যে একচেটিয়া অধিকার। গত এক হাজার বছরে আমাদের সোনার ভাণ্ডারও তো প্রায় ফতুর হ’য়ে এসেছে।

বল্লুম, “ধর্ম্মের নামে দম্ভ আমরা কম করিনি। কিন্তু ইজ্জতের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রতিবারই পরাস্ত হ’য়েছি। ধর্ম্মটা কোনরকমে বেঁচে গেলেও ইজ্জৎ বাঁচাতে পারিনি। মুখুজ্জে মশাই, আপনার তো বরাত ভাল। পাঁচটি বালবিধবা কন্যা ও পুত্রবধূ নিয়ে ঘর করছেন, অথচ আপনার ধর্ম্মানুমোদিত সংসার পরিচালনায়, উক্ত পাঁচটি বাল-বিধবার একটিও আজ পর্য্যন্ত সতীদাহ পালনের কল্পনা ক’রেনি।”

হেসে উঠলেন মুখুজ্জে মশাই। অত্যধিক প্লীহা-স্ফীতির জন্য শরীরটা তার আজ ভাল ছিল না। তবু কেউ যদি ধর্ম্মের উপর আঘাত করে, তিনি প্রতিঘাত না

ক'রে থাকতে পারেন না। বিশেষ ক'রে হিন্দু-আত্মীয়ের মুখে, হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রূপ, তিনি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করবেন কেন? কুটুম বলে, তাকে ক্ষমা করা কাপুরুষতা। মুঘল রাজত্বে, রাজপুতানীরাও হেরেমে গিয়ে, শাস্ত্রমতে জপ তপ করতেন বলে, কোন কোন সনাতনপন্থী থিসিস বিশারদরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। সমগ্র মুসলিম রাজত্বে আমাদের উড্ডীয়মান ধর্ম্মের ফানুসে আঘাতই যদি লাগবে তবে রাজপুতানীর জপ-তপের অর্থ কি? আকবরের ভারতব্যাপী ঐক্য সাধনের দিবাস্বপ্নে, রজনীর মুহূর্ত্তগুলো কেটেছে অম্বরাধিপতি বিহারীমল্লের কন্যার সাহচর্য্যে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনে রাজপুতানী বেগম অপরিহার্য্য।

একদাগ কুইনিন মিকচার গলধকরণের পর, মুখুজ্জে মশাই বল্লেন, "ভাইরে, হিন্দুধর্ম্ম ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ঠাট্টাই যদি হবে, তবে পাঁচ হাজার বছর পর্য্যন্ত বাঁচল কি করে?"

"যেমন করে বেঁচে আছে আপনার ঐ স্ফীতকায় প্লীহা!"

"ওহে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—পাকিস্থানে বসবাস করছ, সবে তো তিন মাস হ'লো। একেবারে মোচলমানদের মত কথাবার্ত্তা কইছ। কর্ম তো অনেক করলে, এ'বার বুড়োকালে একটু ধর্মে মন দাও।"

আমাদের ধর্ম. বুড়োকালের উপযোগী বলেই সম্ভবতঃ মুখুজ্জে মশাই আমায় অনুরূপ অনুরোধ করলেন।

বল্লুম, "আমাদের স্বজাতির মধ্যে খুব স্পষ্ট ক'রে দেখেছি যে, মহামান্য ইংরেজের পদতলে, জীবনটাকে নিবেদন ক'রে মুসলমানের হোটেলে, কোপ্তা-কাবাব উজাড় ক'রে, পেন্সন প্রাপ্তির পর, অনেকেই কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে পরকালের জন্য ভিক্ষা করেন যদি একটা গদি-আঁটা আরাম কেদারা পাওয়া যায়। পরকালের কর্মখালির তালিকায় যদি হাজার টাকার বেতনের উল্লেখ থাকে, তবে ভারতবর্ষের সবগুলো মন্দির থেকে তেত্রিশ কোটি সুপারিশপত্র আদায় করা, এমনকি কষ্টকর! মুখুজ্জে মশাই, মোচলমানদের প্রতি আপনার ঘেন্না বুঝি খুব?"

স্ফীতকায় প্লীহার অত্যাচার সত্বেও মুখুজ্জে মশাই হুঁকোর মুখে, তা'র রক্তহীন ঠোঁট দু'টো বিস্তার ক'রে দিয়ে একটা সুখটান্ দিলেন। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যার পূর্ব্বে, জাফর-আলীর প্রস্তুত তামাকুর গায়ে আগুন ধরিয়ে, সুখটান্ দে'য়ার দরকার হয়। তামাকুর মোচলমানত্ব শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, গঙ্গাজলের সংস্পর্শে এসে।

মুখুজ্জে মশাই মুখ থেকে ধোঁয়া বার করে বল্লেন, "আমার তো ঘেন্না আছেই। কিন্তু, তোমার যখন এত

ভালবাসা, তখন আজ পর্য্যন্ত মুসলমানধর্ম গ্রহণ করোনি কেন ?”

বল্লুম, “করিনি এইজন্য যে আমার বয়সে, কোন ধর্মের মধ্যদিয়েই আর ভগবৎপ্রাপ্তির আশা নেই। নিজের ধর্মে বিশ্বাস ক'রে সবাই বাঁচে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের সমষ্টিগত ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা ক্রমাগতই মরছি। সে যা'ক মুখুজ্জে মশাই। যে বাঁচে বাঁচুক, আর যে মরে মরুক। এ'বার চলুন, আপনার অন্দরমহলে একবার প্রবেশ করি। তর্ক করতে তো আসিনি—এসেছি কুটুম সাক্ষাতে।”

*   *   *   *

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা বৈঠকখানায় বসে বসে ভাবছিলুম যে রাজপুরের জীবন-প্রবাহে নগেন মণ্ডলের উদ্বেগ কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। এক মাইলের ব্যবধানে সুরাজপুরের ঝড় হিন্দুস্থানের আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘের সূচনা করেছে ব'লে মনে হলো না। বার মাসে তেরো পার্ব্বনের ঘটা অব্যাহত রয়েছে।

প্রায় দু'শ বছর পর, ইংরেজের জাহাজে চেপে ইংরেজরা যে চলে গেল, তার জন্য কারো কোন জিজ্ঞাসা বা মাথাব্যথা নেই। দু'শ বছরের পাগড়ী-পরা চৌকীদারের যখন কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, তখন ইংরেজ

শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে, পল্লীবাসীর মানসিক মর্য্যাদা বোধেও কোন বিপ্লব ঘটেনি। নিতাই চৌকিদার চোর ধরবে বলে, রাত্রির আহারের পর কম্বল মুড়ি দিয়ে সনাতন বসুর রোয়াকে শুয়ে আজও ঘুমোয়। ঘুণে-ধরা বাঁশের লাঠিটা এমন ভাবে রোয়াকের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখে যে সাবধানী চোরের দল, দূর থেকে দেখলেই বুঝতে পারে যে নিতাই চৌকিদার সজাগ ও সতর্ক আছে। সেইজন্য ১৫-ই আগষ্টের পর, ঐ সব অঞ্চলে চোরের উৎপাতও কমেনি আর চৌকিদারদের পাহারাও বন্ধ হয়নি।

ইংরেজের শাসনে ভয় ছিল না, কিন্তু রাজ্যহীন মুসলমানের সান্নিধ্যে এ'যাবৎকাল কেউ ভাল ক'রে ঘুমুতে পারত না। ইংরেজের দয়ায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে, তাই মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'লো। দূরত্ব যদিও এক মাইলের বেশী নয়, তবুও এ' গাঁয়ের বাল-বিধবাদের তেমন কোন আর ভয় নেই। তারা পরম নিশ্চিন্তে ইহলোকের মুখে আগুন দিয়ে পরলোকের জন্য ধ্যানে বসতে পারে। রাজপুরের আদমসুমারিতে দেখা যায়, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের চাইতে বালবিধবার সংখ্যাই বেশী। ভগবৎ প্রাপ্তির ও মুক্তির প্রতি-যোগিতায় হিন্দুস্থানের বালবিধবারা প্রাচীন কাল থেকে চিরস্মরণীয়া।

একটুপর মুখুজ্জে মশাই, প্রাচীন অভ্যাস মতো কুইনিন মিকচারের বোতল ও হুঁকো হাতে এসে বৈঠকখানায় বসলেন।

ইস্কুলের ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজলেই, তিনি দ্বিতীয় দাগ ঔষধ সেবন করেন। প্রথম প্রথম মিকচার সেবনের পর, তার দরকার হ'তো এলাচ কিংবা কোন সুগন্ধী মশলার। কিন্তু অভ্যাস পুরনো হয়েছে বলেই, আজকাল মিকচারের তিক্ততায় তেমন আর বিস্বাদ আসে না।

"কি হে ভায়া, একটা দিন যে ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলে। একবার দেখে এস, স্বাধীন রাজপুরের সব কাণ্ডকারখানা। প্যাণ্টুলুন পরে ইংরেজ ভেবেছিল, মহাত্মার নগ্নতায় কোন শক্তি নেই। দেখলে তো, খৃষ্টানগুলো কেমন সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে সরে পড়ল? ভায়া ঐ দে'য়ালে টাঙ্গানো মহাত্মাকে একবার প্রণাম করো।"

বল্লুম, "মহাত্মা তো বামুন নয়, বেনে। প্রণাম করবেন কি করে?"

আশ্চর্য্য ভাবে মুখুজ্জে মশাই জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, এতদিন বেনেই ছিলেন। ইংরেজকে তাড়িয়ে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছেন। জন্মসূত্রে বেনের ছেলে গান্ধী কিন্তু কর্ম্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হয়েছেন মহাত্মা। মারামারি নেই, রক্তপাত নেই,

কামান বন্দুক প'ড়ে রইল, হঠাৎ বড়লাট বলে বসলেন, "আমরা চল্লুম। অহিংসার চাপে বড়লাট কাবু।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "বড় লাট কাবু হওয়ার পর, রাজপুরে সব সুখেই আছে মুখুজ্জে মশাই ? দু'শ বছরের অশান্তির মেঘ কেটে গেছে কি বলেন ?"

"ভাই রে, অশান্তি কি এত সহজে কাটে ? সবই ভাল হলো, শুধু ঐ যে পাকিস্থানের সীমান্ত, সে যেন নাকের ডগায় টানা হয়েছে। ভবিষ্যতে ওদিক থেকে উৎপাত হওয়া অসম্ভব নয়।"

"উৎপাতের কিছু আশংকা আছে ?"

"হ'তে কতক্ষণ। কে একটা নোয়খালির মেয়ে এসেছে এখানে, তোমাদের সুরাজপুর থেকে। সেই মেয়েটাকে নিয়ে কতোগুলো ছোঁড়ার দল, মুসলমানদের সংগে একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। ছোঁড়ারা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে পরামর্শ পর্য্যন্ত নেয় না।"

এমন সময় গাঁয়ের ব্রজেনবাবুর ছেলের সংগে একটি যুবক এসে ঘরে প্রবেশ করল। সে একবার দেয়ালে টাঙান মহাত্মার ছবির দিকে দৃষ্টি দিল। যুবকের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ছিল না বিদ্রূপ ছিল, সঠিক ক'রে বুঝতে পারলুম না।

ব্রজেনবাবুর ছেলে বল্ল, "মেসোমশাই, ইনি এসেছেন আপনার কাছে !"

"বলুন, কি চান আপনি ?"

"আমি রাজপুরের লোক নই। রাজপুরে এসেছি এখানে ছেলেদের নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য একটা ছোটখাট দল গঠন করবার জন্য। আপনি বৃদ্ধ, আপনার কাছে দৈহিকশক্তি ভিক্ষা করছি না—কিছু আর্থিক সাহায্য চাই। আমাদের কোন বাঁধান খাতা নেই যে চাঁদা বলে আপনার কাছে পয়সা চাইব।"

"হঠাৎ আত্মরক্ষার জন্য গাঁয়ের ছেলেরা চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে কেন ? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার অর্থ কি ?"

যুবক বল্ল, "এ তো বনের মোষ নয়—এ যে ঘরের বাঘ। আপনি কি জানেন না, সুরাজপুরের মণ্ডলদের ঘরে বাঘ পড়েছে ?"

এমন সময় ইস্কুলের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। মুখুজ্জে মশাই তাড়াতাড়ি বোতল থেকে দ্বিতীয় দাগ মিক্‌চার ঢেলে নিয়ে, সবাইকে যেন সম্বোধন করে বল্লেন, "ম্যালেরিয়ায় এ অঞ্চলটা একেবারে উজাড় হ'য়ে যাবে। চাল নেই চাল নেই ব'লে দিশী-সরকার একেবারে পাগলা হ'য়ে উঠেছে। বলি, চাল তোর খাবে কে ? পেট ভর্ত্তি সবারই যে শুধু পিলে আর পিলে।"

যুবকটি বল্ল, "আমরাও তাই বলি। চাল যোগাতে যে-পরিশ্রম ও পয়সা সরকারের খরচ হচ্ছে, সেই পয়সা

দিয়ে চাল না কিনে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কেনা ভাল কিংবা ম্যালেরিয়ার মূলে আঘাত করা ভাল।”

মুখুজ্জে মশাই বল্লেন, “আরে ভাই, ভাল বল্লেই তো আর ভাল হয় না। ভালটা আর আছে কোথায় শুনি? খাব একটু কুইনিন্-মিকচার, তার মধ্যেও পঙ্কজ ডাক্তার প্রায় তিনপোয়া অংশ ভেজাল চালাচ্ছে। ব্যাটা তুই না হয় নিজে পাঁকে জন্মেছিস, তাই ব'লে ঐ পচা পুকুরের জল এনে, তুই বল্লি কি না কুইনিন মিক্‌চার? নাঃ ইংরেজ চলে যাওয়ার পর জীবনে আর সুখ নেই ভায়া।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “ইংরেজ আমলে বুঝি খুব সুখ ছিল মুখুজ্জে মশাই?”

“সুখ না থাকুক, শান্তি ছিল তো। অন্ততঃ মোচলমানগুলো অমন উৎপাত করতে সাহস পায়নি। এই তো সবে সেদিন ওরা গেল, আর অমনি তোমরা সব বলতে আরম্ভ করেছ যে সুরাজপুরে বাঘ পড়েছে। সুরাজপুরে বাঘ পড়েছে ব'লে, আমাদের গাঁয়ের ছেলেরা আত্মরক্ষা করতে আরম্ভ করল কেন?”

যুবক বল্ল, “দূরত্ব যে বেশী নয়। সবে তো মাত্র এক মাইল রাস্তা। আর বিশেষ করে আপনাদের গাঁয়ে যে শীকার রয়েছে।”

আমি লক্ষ্য করলুম, মুখুজ্জে মশাই-র পাঁচটি বাল-

বিধবা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে যুবকের ভবিষ্যৎ শীকার কাহিনী শুনছিল।

"আমাদের গাঁয়ে শীকার রয়েছে, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

মুখুজ্জে মশাই হুঁকোর দিকে হাত বাড়ালেন।

যুবক বল্ল, "নোয়াখালির মেয়ে মালতী, পালিয়ে এসেছে সুরাজপুর থেকে। এখানে এসে সে আত্মগোপন করেছে, কারণ আপনারা তাকে আশ্রয় দেননি। মুসলমানরা তাই ঠিক করেছে, রাজপুর আক্রমণ করবে।"

"আক্রমণ করলেই হলো? হিন্দুস্থানে বুঝি পুলিশ পাহারা নেই? নেপালের হিন্দু রাজার কাছ থেকে হাজার দশেক বল্ বাহাদুর আর যম বাহাদুরদের নিয়ে এলেই তো হয়? আর মেয়েটা যখন এতদিনই রইল পাকিস্থানে, তখন আবার তার এদিকে আসবার দরকার ছিল কি? এক কাজ করুন, মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলুন কলকাতায়। আমি জানি, ঐসব মেয়েদের জন্য কলকাতায় সব ভাল ভাল বিধবা আশ্রম আর অনাথ আশ্রম আছে। বুঝলে ভায়া রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, সে সব আশ্রমের যা' ব্যবস্থা, সে প্রায় গ্রাণ্ড-হোটেলের মতো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "গিয়েছিলেন বুঝি দেখতে?"

"না গেলেও খবর জানি যে সেখানে মেয়েরা বেশ সুখেই আছে।" যুবকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পুনরায়

বল্লেন, "আপনারা চেষ্টা করে দেখুন, ঐসব কোন একটা আশ্রমে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন কি না। মেয়েটার নাম যেন কি ?"

ব্রজেনবাবুর ছেলে বল্ল, "মালতী"।

মুখুজ্জে মশাই যেন হঠাৎ নামটা একটু আগেই স্মরণ করতে পেরেছেন, এমন ভাব দেখিয়ে বল্লেন, "ঠিক, ঠিক মনে পড়েছে। দক্ষিণ পাড়ার ডেপো ছেলেগুলো একদিন এসে বলে কি, দাদু আপনার বাড়ীতে অনেকগুলো ঘর আছে, এই মেয়েটার জন্য একটা দিতে হ'বে। ওহে রঘুনাথ, বুঝতে পারলে ত ঐসব ছেলেগুলোর বজ্জাতি! গাঁয়ে আর স্থান জুটল না, একেবারে মুখুজ্জে বাড়ী! আমার মনে হয়, মেয়েটার ভবিষ্যৎ জীবন রক্ষে করতে হ'লে আর কালবিলম্ব না ক'রে, কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।"

যুবকের এবার মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল। সে বল্ল, "ভবিষ্যৎ কার্য্যসূচী সম্বন্ধে আপনার সংগে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এসেছিলাম বিশেষ করে—আপনি সম্ভব খবর রাখেন না যে বর্ত্তমানে সে সব আশ্রমগুলোতে আর তিল ধারণের জায়গা নেই।"

"জায়গা না থাকলে, আপনারাই বা করবেন কি! দেশের সরকার যদি এ বিষয়ে এগিয়ে না আসে, তবে আমার চাঁদায় আর কতদূর এগুবে ? তার চাইতে এক

কাজ করুন, মেয়েটাকে ঐ সুরাজপুরেই ফিরে যেতে বলুন!”

যুবক এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। হিন্দুর ছেলে বলেই মুখুজ্জে মশাইকে এখনো আক্রমণ ক’রেনি। একটু সামলে নিয়েই সে বল্ল, “আপনার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। মরবার আগে একটু পুণ্য করা ভাল। দু’ চার টাকা চাঁদা দিয়ে যদি সে পুণ্য আপনি অর্জ্জন করতে পারেন, তবে ভাববেন যে আপনি ভাগ্যবান। মেয়েটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরাশ হ’য়ে পড়েছেন, আমরা কিন্তু ততটা আশা হারাই নি।”

“তা’র মানে? আপনারা কেউ বুঝি মেয়েটিকে বিবাহ করবেন?” মুখুজ্জে মশাই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

যুবক বল্ল, “মেয়েটি তো বিবাহিতা। মেয়েটি মরে গেছে মনে করে, পূর্ব্বের স্বামী আবার বিবাহ করেছেন। কিন্তু সে সব আলোচনায় মেয়েটির কোন উপকার হবে না। আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করুন। আরও দু’ চার জায়গায় যেতে হ’বে তো।”

মুখুজ্জে মশাই অসহায়ের মত আমার দিকে চাইলেন। বল্লুম, “কি আর করবেন মুখুজ্জে মশাই, দিয়ে দিন দু’চার টাকা। একবার একটা ইংরেজ মেয়েকে সীমান্তের

পাঠানরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়েটির উদ্ধারের জন্য খৃষ্টান জগতে এত চাঞ্চল্য হয়েছিল যে শেষ পর্য্যন্ত পাঠানরা ভয় পেয়ে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আজকে একটা হিন্দু মেয়েকে আশ্রয় দিতে না পারেন, দু'চার টাকা চাঁদা দিতে আপত্তি কি ?"

"কথাটা মন্দ বলো নি ভায়া। তবে কি জান ? দু' চার টাকা দিতে পারব না। আমার কাছে এখন এক টাকা বারো আনা আছে।"

যুবকটি আমার বক্তব্যের অপেক্ষা না রেখে বল্ল, "তাই দিন। জুলুম তো আমরা করতে পারি নে।"

মুখুজ্জে মশাই ট্যাঁক থেকে এক টাকা বারো আনা বার ক'রে যুবকের হাতে দিয়ে বল্লেন, "এ সব জুলুম ছাড়া আর কি ? কুটুম বাড়ীতে বেড়াতে এসে ভায়া ওকালতিটা মন্দ করো নি। কিন্তু এ সব জুলুমের কথা যদি আমাদের সরকার বাহাদুর শুনতে পান, তবে আপনাদের কাজের অসুবিধে হওয়া অসম্ভব নয়।"

একটু হেসে যুবকটি, ব্রজেনবাবুর ছেলের সংগে বেরিয়ে গেল।

লক্ষ্য করলুম, এ'বারও যাওয়ার সময় যুবকটি দেয়ালে টাঙান মহাত্মার ছবির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল। শ্রদ্ধা না বিদ্রূপ, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সে'দিন সন্ধ্যের সময় একটু বাইরে বেরুব মনে করছি,

এমন সময় মুখুজ্জে মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে যাচ্ছ কোথায় ?"

বল্লুম, "যাই, দু'চার জনের সংগে একটু দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আসি। কালই সুরাজপুরে ফিরব ভাবছি। আচ্ছা মুখুজ্জে মশাই, জগদীশচন্দ্র আমায় লিখেছিল, সে আপনার কাছে তিরিশটা টাকা পাঠিয়েছে। টাকাটা কি এসে গেছে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো প্রায় সপ্তাহখানিক আগেই এসেছে। আমি তো তোমায় আজই দেব বলে ভাবছিলাম। এই দেখ না ভায়া, টাকাটা যে একেবারে নিয়েই বসে আছি! এই নাও।" তিরিশ টাকা থেকে একটাকা বারো আনা বাদ দিয়ে, আটাশ টাকা চার আনা আমার হাতে দিলেন! রাজপুরের আত্মরক্ষার চাঁদা, পাকিস্থানের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে আদায় হ'লো।

ওকালতীর জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া গেল না, উপরন্তু খরচ হলো এক টাকা বারো আনা। এতে যদি রাজপুর বাঁচে তো ভাল।

* * * *

সন্ধ্যের একটু আগেই বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। দেবেন রায়ের বাড়ীর কাছে যখন এসেছি, তখন দেখা হ'লো সেই যুবকটির সংগে।

যুবকটি বল্ল, "আপনি তো থাকেন স্বরাজপুরে। রাজপুর এসেছেন বেড়াতে বুঝি ?"

"বেড়াতে এসেছি বলতে পারি না। একটু কাজও ছিল। আমি স্বরাজপুরে থাকি, এ খবর আপনি জানেন কি করে ? যাওয়া-আসা আছে বুঝি স্বরাজপুরে ?"

"তা একটু-আধটু যাই বৈকি! আপনি ত জানেন, আজকাল ঐসব অঞ্চলে যাওয়া-আসা নিরাপদ নয়।" যুবকটি হাসল। জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন কোন্‌দিকে যাচ্ছেন ?"

যুবক বল্ল, "দেবেন রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে একটা সভা আছে ব'লে খবর পেয়েছি। আমায় ওরা ডাকেনি, তবুও কৌতূহল হচ্ছে, একবার সভামণ্ডপে গিয়ে শ্রোতার দলে বসে পড়ি। চলুন না আপনিও। কাজ নেই তো ?"

বল্লুম, "না কাজ আর কি। চলুন যাই।" যুবকটির সংগে ভিতরে গিয়ে বসলুম। বেশী জনসমাগম হয়নি। যুবকের সংখ্যা খুবই কম। দেবেন রায় তা'র নিজের বাড়ীর সভায় নিজেই সভাপতি। দেবেনবাবু, রাজপুরের একজন বিশেষ দরদী-কংগ্রেস-সেবক। যুদ্ধের বাজারে, ঘরে বসেই টুক্‌-টাক্‌ কাঁচামাল সাপ্লাই দিয়ে কিছু পয়সা করেছেন। লোকে বলে, তাঁ'র পয়সা প্রচুর। যুদ্ধের বাজারের টুক্‌-টাক্‌ মানেই লাখের কম নয়।

সভার কাজ আরম্ভ হ'লো। কংগ্রেসের চার আনা মেম্বার হরেন ঘোষ বল্লেন, "আজকের সভার গুরুত্ব

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, মহাত্মার আপ্রাণ চেষ্টার পরও, সাম্প্রদায়িক বিষের প্রচুর ছড়াছড়ি হচ্ছে। পাকিস্থান নিয়ে আমাদের অযথা সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, কারণ আপনারা জানেন, পাকিস্থান কিছুতেই টিকবে না।"

যুবকটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে উঠল, "না, আমি তো এমন জানি না যে পাকিস্থান কিছুতেই টিকবে না। যদিচ আমি কংগ্রেসের এক পয়সারও মেম্বার নই, তবুও এ আবিষ্কার আমার একেবারে জানা নেই। দয়া করে আমায় বুঝিয়ে দিন, কেন পাকিস্থান টিকবে না।"

সভাপতি বল্লেন, "আজকের সভার বিষয়বস্তু পাকিস্থানের ক্ষণ-স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নয়। সুতরাং যুবকের প্রশ্নের উত্তর দিতে, হরেনবাবু বাধ্য নয়। সভার মূল-প্রস্তাব ছাড়া অন্য বিষয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।"

হরেন ঘোষ পুনরায় বল্লেন, "আপনারা জানেন যে আজ ক'দিন থেকে, সুরাজপুরের মধ্যে একটা অজ্ঞাত কারণে অনর্থক মনোমালিন্য চলেছে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে সুরাজপুরের মুসলমানরা সীমান্ত অতিক্রম করবার জন্য কুচকাওয়াজ করছে। সভার মূল-প্রস্তাব অনুযায়ী, আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি যে যদি তেমন কোন আশংকা থাকে, তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি।

আপনাদের কর্ত্তব্য ঠিক হ'লে সেই কর্ত্তব্যানুযায়ী মূল-প্রস্তাবের একটা কপি আমরা জিলার কংগ্রেস কমিটিতে পাঠাব।"

দারুণগতি মুন্সী বল্লেন, "পাকিস্থানের কুচকাওয়াজ স্বুরু হওয়ার মানেই প্রায় শেষ হওয়া। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ করা যায় যে ওরা মূল-প্রস্তাব নিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করবার আগেই প্রায় দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে। আমরা যখন ভোটের জন্য (অর্থাৎ মূল-প্রস্তাব পাশ করাতে) ক্যান্‌ভাসিং করছি, তখন ওরা দিল্লীর কণ্ঠ চেপে, শেঠ-পরিবারবর্গের নারীকণ্ঠ থেকে সোনা ও মণি-মুক্তোর অলঙ্কারগুলো খুলে ফেলেছে—অর্থাৎ ততক্ষণে স্যাকরা ডেকে, অলঙ্কারগুলোকে গালিয়ে, খাদটুকু বাদ দিয়ে একেবারে পাকা সোনার কতোগুলো গোলক তৈরী ক'রেছে। স্বুতরাং আমি বলতে চাই, এক্ষুণি আমরা প্রস্তাব করছি যে রাজপুর ডিফেন্স-কমিটি নামে একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হউক।"

হরেন ঘোষ প্রতিবাদের স্বুরে বল্লেন, "দেখুন, ডিফেন্স কথাটা তেমন স্বুবিধের মনে হচ্ছে না। ডিফেন্স কথাটার কি কোন উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা নেই? কংগ্রেসের নীতি অনুসারে যতটা সম্ভব জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। যদিও জানি, ভারত সরকারের ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট এখনো বর্ত্তমান।"

রাজপুরের হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি যামিনী মৌলিক বল্লেন, "ডিফেন্স কথাটা বলতেও ভাল, শুনতেও ভাল, এমন কি আমরা যদি ডিফেণ্ড করবার পূর্ব্বেই পালিয়ে যাই তবুও কথাটা থেকে যা'বে। তবে জাতীয় ভাষার অনুরাগীদের সন্তুষ্টির জন্য আমি এমেণ্ডমেণ্ট ক'রে বলতে চাই, রাজপুর-লড়াই-কমিটি।"

সভাপতি প্রশ্ন করলেন, "আবার কমিটি কেন?"

"বেশ তো কমিটিকে সরিয়ে দিয়ে সমিতি করতে কতক্ষণ লাগবে? সুতরাং নামাকরণ হলো রাজপুর-লড়াই-সমিতি।"

হরেনবাবু বল্লেন, "লড়াই কথাটার মধ্যে জুলুমের ইঙ্গিং রয়েছে। এ গাঁয়ের হিন্দু ভোটাধিক্যে প্রমাণ করা সহজ হবে যে প্রতিষ্ঠানটির সংগে গোড়াতেই লড়াই কথাটা অপ্রয়োজনীয়। দেবতার চণ্ডীমণ্ডপে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, সেখানে এমন উত্তেজক লড়াই বস্তুটিকে পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত হ'বে।"

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, "লড়াই তো করবে যুবকরা, আপনারা এতো আশংকিত হ'য়ে পড়ছেন কেন?"

যামিনী মৌলিক বল্লেন, "ছেলেরা তো আর ভূঁইফোড় নয়—তা'দের মা বাবা নেই? ছেলেরা লড়াই করতে গেলে পিতার মনে আশংকা আসবে, সে তো জানা কথা।"

দারুণগতি মুন্সী বল্লেন, "হরেনবাবু কিংবা যামিনী মৌলিকের তিন ছেলেই তো কলকাতায় থাকে। দু'দিন আগে নোটীশ পেলেও, তা'রা রাজপুর এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই লড়াই সম্ভব শেষ হ'য়ে যাবে। কিংবা লড়াই শেষ হওয়ার পর তারা এসে উপস্থিত হ'বে। আসবে তো তারা রেলগাড়ীতে, কিন্তু আজকালকার ট্রেণগুলোর না আছে গতি, না আছে সময়জ্ঞান। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই, ট্রেণ যদি পানচুয়েলী না আসে, তবে যামিনীবাবু ইত্যাদির ভয় কি? সুতরাং রাজপুর-লড়াই-সমিতির পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠানের নাম করা হোক আক্রমণ-সমিতি। অর্থাৎ আক্রমণ করার বাসনা যদি সত্যিই আমাদের থাকে, তবে নামের কোন দরকারই নেই। আসলে নাম কিংবা লড়াই এই উভয় প্রস্তাবই আজকের মত মুলতুবী থাক— অর্থাৎ লড়াই আমাদের করতেই হ'বে এমন অঙ্গীকার কি আমরা করেছি আমাদের সুহাসিনী-কমলা-বিমলা পত্নী-গোষ্ঠীর কাছে? আর তেমন অস্বাভাবিক অঙ্গীকার যদি আপনারা কেউ করেও থাকেন, তবে সে অঙ্গীকার রক্ষা করা কার্য্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে, সম্ভব নয় এইজন্যে যে আমাদের আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার উপযোগী কোন উল্লেখযোগ্য অস্ত্র নেই। অস্ত্র নেই ব'লে আমরা যে সব বসে থাকব, সে কথাও ঠিক নয়। মনে করুন, যেই মুহূর্ত্তে খবর আসবে ওরা সীমান্ত অতিক্রম করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই,

সম্ভব হ'লে তার কিছু আগে থেকেই, আমরা আমাদের সুহাসিনী, কমলা, বিমলা ইত্যাদিকে নিয়ে, মানে যদি হাতে একটু সময় থাকে, তবে দু'চারটে সাংসারিক জিনিষ, ধরুন রাজপুরের উৎকৃষ্ট পাটালি গুড়, বারাণসীর উত্তম ও অকৃত্রিম সাবিত্রী সিঁদুরের কৌটা এট্‌সেট্‌রা সব নিয়ে এ অঞ্চল থেকে ইভ্‌কুয়েট করব। খবরের কাগজে আমাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের দুঃখের জন্য দু'চারটে কল্যম সব সময়েই ফাঁকা থাকে। এমন কি প্রকৃত দুঃখ সুরু হওয়ার আগেই দুঃখের ইতিহাস সব লেখা হয়ে থাকে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে, মানে, বক্তাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তাই তাঁরা কিছুদিন আগেই এই পল্লীগ্রাম থেকে পরিবার সরিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি, আজকের মতো সভা মুলতুবী থাক।”

দারুণগতি মুন্সীর যুক্তি ও কণ্ঠের জোরে চণ্ডীমণ্ডপের সভায় খানিকটা শৈথিল্য এল। কেউ যেন আর কথা কইতে সাহস করছে না। কিন্তু সভাপতি সাহস ক'রে বল্লেন, “যারা পরিবার সরিয়ে ফেলেছেন, তা'দের জন্য আমাদের ভাবনা নেই। এই সভা আহুত হয়েছে তা'দের জন্যই যারা এখনো এখানে বসবাস করছেন। কিংবা আক্রমণ সুরু হওয়ার পরও যারা বসবাস করবেন। আমাদের উচিত, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আর কালবিলম্ব না করে পাকিস্থান সীমান্তের একটা পুরোপুরি

রিপোর্ট পাঠিয়ে দে'য়া। সরকারের তরফ থেকে যদি সাঁজোয়া গাড়ী আসে তবে আমাদের আর যুদ্ধের-সাজ পরবার দরকার কি? আমার তো মশাই, চোদ্দপুরুষে কেউ যুদ্ধ করেনি—আজকে হঠাৎ গোয়ার্ত্তুমি ক'রে যুদ্ধের সাজ পরলেই যে যুদ্ধ করতে পারব, তেমন কথা আমি জোর ক'রে বলতে পারব না।"

যামিনীবাবু বল্লেন, "হিন্দু মহাসভার দলগত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সামরিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান অহিংস গভর্ণমেণ্টের ভয়ে, আমরা কুচকাওয়াজ করি না বটে, তবে আমাদের সদস্যদের রক্তে সমর-পরিকল্পনার তেজ বড় কম নয়। দারুণগতিবাবুর বক্তৃতা শুনতে ভালই লাগল, কিন্তু ঐ যে তিনি পাটালি গুড়ের ভাণ্ড সম্বন্ধে কিংবা সাবিত্রী সিঁদুর সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন, সেটা বড় নৈরাশ্যজনক।"

এমন সময় সবাই যেন শুনতে পেলেন, বহুদূর থেকে একটা ধ্বনি আসছে, "আল্লা-হো-আকবর"।

সহসা হরেন ঘোষ বল্লেন, "সভায় উপস্থিত সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছা অনুসারে এই সভা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রইল।" হরেন ঘোষ, সেই ধ্বনিটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন সবার আগে।

* * * * *

যুবকের সংগে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি? বসিরুদ্দীনের দল এদিকে আসছে না কি?"

যুবক বল্ল, "আমি যতদূর জানি, দু' একদিনের মধ্যে ওরা এদিকে আসবে বলে মনে হয় না। অবিশ্যি এ কথা আমি বলতে চাই না যে ওরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত নয়। শক্তিশালী যারা, তারা প্রতিপক্ষের দুর্ব্বলতার খবর জানলে, সব সময়েই প্রস্তুত থাকে। মহম্মদ উজবেক খাঁ পাকিস্থান সরকারের কাছে হিন্দু জুলুমের একটা মিথ্যে রিপোর্ট পেশ করেছেন। তিনি যদি পাকিস্থান সরকারের কোন রকম একটু নৈতিক সহানুভূতি পান, তবে আর কালবিলম্ব করবেন না। আমি যা খবর পেয়েছি, তা'তে মনে হয়, সদর থেকে এখনো কোন খবর আসেনি।"

বল্লুম, "আচ্ছা মেয়েটিকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল্লেই তো হয়? আপনার কি মনে হয়না যে রাজপুর গ্রামে মেয়েটি তা'র ভবিষ্যৎ হাবিয়ে ফেলবে?"

"সে প্রশ্নের উত্তর আমি কি ক'রে দেব বলুন? আমি তো কোন নির্দ্দিষ্ট মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবার জন্য এ গাঁয়ে আসিনি। তবে আপনি যদি এ প্রশ্নের উত্তর চান, তবে চলুন আমার সংগে, মেয়েটির কাছে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তার কাছে সম্ভবত উত্তর

পাবেন। গত এক হাজার বছরে যে-সব অসংখ্য মেয়ে এমনি ক'রে হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজ ইতিহাস দিতে পারেনা বলেই, আপনি আজ মালতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু আশংকিত হয়ে পড়েছেন। চলুন, এইদিক দিয়ে যাই—খুব তাড়াতাড়িই তবে পৌঁছে যাব।" যুবকটি রাস্তার মোড় ঘুরল।

জিজ্ঞাসা করলুম, "মেয়েটি থাকে কার কাছে?"

"কারো কাছেই নয়। একটি পরিত্যক্ত বাড়ী আমরা ভাড়া নিয়েছি। সেখানেই থাকে মালতী। এই দেখুন না, বাড়ীটা পাকিস্থান সীমান্ত থেকে কতো কাছে। ঐ যে কিছু দূরে একটা বাতি দেখা যাচ্ছে, ঐ হচ্ছে পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লার অবস্থান। এই যে এসে গেছি—ভেতরে আসুন।"

এক-চালা টিনের ঘর—দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল মালতী।

যুবকটি বল্ল, "আপনারা ব'সে গল্প করুন, আমি যাচ্ছি।" যুবকটি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে অন্ধকারে মিশে গেল।

কি বলে সম্বোধন করব? সেই অন্ধকার রজনীতে পাকিস্থানের সীমান্তের দিকে চেয়েছিল মালতী। মালতী কে? পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লার বাতিটা একটু নড়ে উঠল ব'লে মালতীও যেন একটু দুলে উঠল। দুটো রাষ্ট্রের

মাঝখানের মানচিত্রটা যেন কাল, কুটিল আর কেউটের মতো ভয়ঙ্কর।

মালতী জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে কি বলে ডাকব?"

"ষাট বছরের বুড়োকে কি বলে আর ডাক্‌বে মা? জেঠা, দাদু—যা তোমার সুবিধে হয়। চল, ভেতরে গিয়ে বসি।"

বিবাহিতা হিন্দু নারীর দেহ-সজ্জায় যেটা সব চাইতে স্পষ্ট, যেটা সব চাইতে লাল, সেটা সিঁদুর। মালতীর সীমন্তে সিঁদুর নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মালতীর আহ্বানে চমকে উঠলাম।

"দাদু সীমন্তের দিকে চেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছেন সম্ভব? বিবাহিতা হিন্দুর মেয়ের কপালে সহস্র দুঃখের মধ্যেও সিঁদুরের গর্ব্ব চিরবিদ্যমান। সিঁদুরহীন সীমন্ত থেকে আপনার বুঝতে কষ্ট হবে যে আমার নাম মালতী না নূরজাহান। কিন্তু সে-সব কথা আপনার সংগে আলোচনা করব না। সিঁদুরের ওপর লোভ ছিল বলেই পালিয়ে এসেছিলাম হিন্দুস্থানে। ফুলের মধ্যে যে সব চাইতে সরষে ফুলই ভাল, সেটা টের পেয়েছি এ অঞ্চলে এসে। সত্যি আমি চোখে সরষে ফুল দেখছি দাদু।" কোন উত্তর দেওয়ার আগেই মালতী বল্লো "হিন্দুস্থানে সম্ভব আমার আর থাকা চলবে না। আশ্রয় মিলল না, কিন্তু আশ্রম মিলেছিল। পুরুষের কাপুরুষতার জন্য

আমায় আশ্রমে গিয়ে থাকতে হবে, ভাবতেও ঘেন্না হয়। তার উপর মনে হচ্ছে, আমার জন্য এ'গ্রামও আক্রান্ত হবে। পুরুষগুলো পালিয়ে যাবে, নয় মরবে। মেয়েদের কথা ভেবে দেখুন তো? দাদু আপনি সম্ভব আমার সব ইতিহাস জানতে চাইছেন। কিন্তু আমি তা' বলতে পারব না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন মা?"

সে বল্ল, "যে-সমাজে আমি ফিরে যাব, সে সমাজের কুৎসা গেয়ে লাভ কি? আপনারা কুৎসাটুকু কাগজে লিখে বাহবা নেবেন সে সুযোগ আমি দেব কেন? ওরা আর যাই হোক, কাপুরুষ নয়।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কুৎসা করবে না বলে এত প্রশংসাই বা করছ কেন? মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুরতায় ওদের যে দেশ জোড়া নাম, সে কথা অস্বীকার করলে চলবে কেন?"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন দাদু—ওরা যেমন আমায় লুট ক'রে এনেছিল, আবার ওদেরই একজন আমায় মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু এ মুক্তি যে আমায় কতো লাঞ্ছনা দিচ্ছে, সে কথা আপনাকে আমি কেমন ক'রে বোঝাই?"

বল্লুম, "তুমি না বোঝাতে পারলেও, আমি বুঝতে পারছি মা। চলো এবার বরং ভেতরে গিয়ে বসি।"

কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই মালতী বল্ল, "এ ঘরে এমন আসন নেই যে আপনাকে বসতে বলতে পারি।

শুনেছি ছেলেরা চাঁদা আদায় করতে পারে না বলে জিনিষ পত্তর কিছুই কিনতে পারছে না। আমার চারদিকে স্বাভাবিকতা আনবার জন্য ওদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।”

“বেশ তো মা, এই ভূমিতেই বসে পড়ি। মায়ের দেওয়া মোটা চাটাইখানা বরং মাথায় ক'রে নিয়ে এলেই হবে। কিন্তু সে-কথা যাক। অতীতের কথা যখন কিছুই বলতে চাইছ না, তখন ভবিষ্যতের দু' একটা কথা বল, শুনি।”

লক্ষ্য করলুম, মালতীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ভাগ্যবতীদের মুখে যে-হাসি অর্থহীন হ'তে পারত, বিড়ম্বিত মালতীর মুখের হাসিতে তার একটা বিশেষ অর্থের ইঙ্গিত পেলুম। ভবিষ্যতের দু' একটা কথার মধ্যে এই কথাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠল যে মালতীর ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ ছাড়া মানুষ তো বাঁচতে পারে না। যা'র আয়ুষ্কাল দু' ঘণ্টার বেশী নয়, তা'রও ভবিষ্যৎ থাকে, সেও মনে করে যে বেঁচে উঠবে—বেঁচে উঠে আবার নূতন ক'রে সংসার সাজাবে—আশে পাশের আরও পাঁচজনের সংগে সে সমান তালে পা মিলিয়ে জীবনের পথে হেঁটে যাবে। তবে, মালতী কেন ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করতে পারছে না? জানি আঘাতের নির্মমতায় শারীরিক ও মানসিক মৃত্যু অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছে—তবুও মৃত্যু যখন জীবনের উপরে নিশ্চিত

যবনিকা টেনে দেয়নি, তখন আশা ছাড়লে চলবে কেন? গুটিকয়েক মুহূর্ত্ত যদি বাঁচতেই হয়, তবে সেই মুহূর্ত্ত ক'টিকে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়।

বল্লুম, "মালতী তুমি আবার নূতন ক'রে বাঁচো। তোমার এই বাঁচার মধ্যে আমাদের সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্যোন্নতির সুযোগ রয়েছে। একটা মালতীকে যদি বাঁচাতে পারা যায়, তবে হাজার মালতীর পুনর্জ্জন্ম লাভ হ'বে, সে তো জানা কথা।"

মালতী বল্ল, "দাদু, নোয়াখালি থেকে সুরাজপুরের দূরত্ব প্রায় তিনশ' মাইল। এই তিনশ' মাইলের মধ্যে আমার প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হ'য়েছিল যে আমি আবার ফিরে যাব আমার স্বাভাবিক জীবনে—আজকের বিড়ম্বনা আগামী দিনের নূতন প্রভাতে আর সম্ভব মনেই থাকবে না। নূতন প্রভাতের উপর বিশ্বাস ছিল বলেই তো ফিরে এসেছিলুম আপনাদের হিন্দুস্থানে।"

বল্লুম, "বিশ্বাস হারিয়েছ জানি। নূতন প্রভাতের আলো তুমি দেখতে পেলে না, সেও আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু মালতী, একপক্ষের বর্ব্বরতার কর্মফলের জন্য অপর পক্ষের সম্ভ্রম-বোধে আঘাত করবে, সে-ই বা কেমন যুক্তি?"

"সম্ভ্রমবোধ? দাদু, কার সম্ভ্রমবোধের কথা বলছেন? যাদের সমস্ত জীবনের প্রসারিত পরিব্যাপ্তি কেবল ঐ

অদৃষ্টের ক্ষুদ্র কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা'দের সম্ভ্রমবোধের কোন বিশেষ অর্থ আছে, এ কথা আমি সহজ বুদ্ধিতে কিছুতেই স্বীকার করতে পারছি না। অপর পক্ষের বর্ব্বরতার সত্যি তুলনা নেই। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অতুলনীয় বর্ব্বরতার প্রতি আমাদের কী অপরিসীম অজ্ঞতা! আমাদের নিজস্ব বর্ব্বরতাগুলোর স্বপক্ষে এ যাবতকাল ধর্মীয় ও দার্শনিক যুক্তি দিয়ে এসেছি অসংখ্য, অথচ আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি যে, কই কেউ তো কখনো সম্ভ্রম-বোধের প্রশ্ন ক'রে নি কোন মালতীকে!"

"প্রশ্ন করেনি—কারণ কোন মালতীই যে আজ পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি। আর যা'রা ফিরে এল, তারা সত্যিই মালতী নয়—-মৃতা। কিন্তু আমাদের নিজস্ব বর্ব্বরতাগুলোর তালিকাটা বলবে কি একবার মালতী?"

"ঠাট্টা করছেন না কি দাদু?"

"না না ঠাট্টা নয় মালতী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সৈনিক ফিরে আসে ঘরে, তা'র মুখ থেকে সমর-কাহিনী শুনতেও ভাল আর বিশ্বাসযোগ্যও বটে। যে কথা আমরা জানি, সে কথা আজ তোমার মুখ থেকে শুনলে, আমাদের বেশী করে ও সত্যভাবে জানা হ'বে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, হেঁসেলের অন্তরাল থেকে আরম্ভ ক'রে, মালতীর জীবনের সীমানা পর্য্যন্ত বর্ব্বরতার সীমা-সংখ্যা নেই, কিন্তু তুমি যদি সে-কথা সমাজপতিদের কাণে গরম সীসের

মতো ঢেলে না দিতে পার, তবে সত্যভাষণের কিছু তো অর্থ রইল না।"

"অর্থ রইল না সত্যি—কিন্তু তাই ব'লে মায়ের দেওয়া মোটা চাটাইতে বসিয়ে আপনার কাণেও গরম সীসের ব্যবস্থা করব, তেমন হৃদয়হীনা তো আমি নই। নোয়াখালির পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যে-কথা আপনাকে তক্তোপোশে বসিয়ে বলা যেত, সে-কথা আজকে খুব অর্থপূর্ণ হ'লেও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এই দেখুন না দাদু, এক পেয়ালা চায়ের পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত নেই আমার। অতিথি আপ্যায়নের অতি সহজ ব্যবস্থাও করতে পারছি না।"

"কিছু দরকার নেই মা। তোমার কথামৃতে আমার চায়ের তৃষ্ণা মিটবে না, তেমন হৃদয়হীন মানুষও আমি নই। তবুও, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম মালতী।"

"বর্ত্তমানের যে-ধরণীতে দাঁড়িয়ে আছি, সে ধরণী যতক্ষণ দ্বিধা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ভবিষ্যৎ আপনার একরকম জানাই রইল দাদু। মরণে আমার ভয় নেই সত্যি, কিন্তু নিরর্থক মরণ-আকাঙ্খাও আমার নেই। খবরের কাগজের খাদ্য জোগাবার জন্য আমার কি মরবার দরকার আছে?"

বল্লুম, "না না, কক্ষনো নয়। গরম সীসে ঢালবে না

ব'লে ভরসা দিয়েছিলে—কিন্তু তোমার ভরসায় তো আর বিশ্বাস করা চলছে না মা।"

মালতী এবার হেসে ফেল্ল। যেন অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে এমনভাব দেখিয়ে মালতী বল্ল, "ছি ছি, সত্যি অন্যায় হ'য়ে গেছে। নিজের ব্যথা অত্যন্ত প্রবল ব'লে, অপরকেও ব্যথার অংশ বিলিয়ে দিতে হ'বে, তেমন মনোবৃত্তি না থাকাই ভাল। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে দাদু। আপনাকে আবার ফিরে যেতে হবে তো।"

"হ্যাঁ এখান থেকেই সোজা সুরাজপুরেই ফিরে যাব ভাবছি।"

"আপনি কি সুরাজপুরেই থাকেন? শুনেছি সুরাজপুরে কোন ভদ্র হিন্দু পরিবার নেই?"

"কিন্তু আমি আছি। জীবনের আর ভয় কি মা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছি। কিন্তু ছেলেটি ফিরবে কখন?"

মালতী বল্লো, "আসা-যাওয়া সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। শুনেছি অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করে পুকুরের তলায় লুকিয়ে রেখেছে। জলে ভিজে ভিজে অস্ত্রগুলো কাজের সময় ফাঁকি না দেয়। বিশেষ ক'রে পুকুরের মালিকের ঐ সম্বন্ধে এখনো খবর জানা নেই কিছু—তাঁর কাছে খবর গেলে বিপত্তি ঘটতে কতক্ষণ লাগবে। দাদু, আপনার

সংগে শুধু তর্কই করলাম, আপনার নামটা আমায় বলে যান এবার।”

বল্লুম, “সুরাজপুরের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীকে সবাই চেনে। দক্ষিণপাড়ায় আমার বাড়ী। এবার উঠি তা হলে মা।”

“আপনার কোন ভয় নেই দাহু? এত রাত্রিতে সীমান্ত অতিক্রম করা নিরাপদ নয়।”

“জানি। কিন্তু ভরসা ঐ লালামিঞা। সীমান্তরক্ষী দলের সেনাপতি সে। আশ্বাস দিয়েছে, সে বেঁচে থাকতে আমায় মরতে দেবে না।”

“লোকটার নাম কি বল্লেন দাহু?”

“লালা—আমাদের বিশ্বস্ত ভদ্রলোক লালামিঞা।”

হেসে উঠল মালতী। মনে মনে সম্ভব আবৃত্তি করল, “ভদ্রলোকই বটে—অভদ্র বসিরুদ্দীনের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে বলেছিল, মালতী তুমি পালাও।”

তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলুম মাঠে। চতুর্দ্দিকের অন্ধকারে পথ আর চোখে দেখা যায় না। আন্দাজ ক’রে পথ হাঁটতে লাগলুম। পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লার বাতিটাকে ডাইনে রেখে, শেষ পর্য্যন্ত সেই নর্দ্দমাটা পার হ’য়ে গেলুম। সম্ভবতঃ প্রহরীরা একটু ঘুমিয়েছে। কুটীরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে ট্যাঁকে হাত দিয়ে অনুভব করলুম যে জগদীশচন্দ্রের প্রেরিত তিরিশ টাকার মধ্যে আটাশ টাকা চার আনা হারিয়ে যায় নি তো!

*　　　　*　　　　*

দূরে বহুদূরে—
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে,
মোর পূর্ব্ব-জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

নির্য্যাতন সে পেয়েছে, সমাজের অবহেলায় আঘাত লেগেছে প্রচুর, অপহরণের কালিমা মাখিয়েছে তার কপালে, কিন্তু মালতী তবুও হারিয়ে যায়নি। নূতন ক'রে সে বাঁচতে চায়। যারা ওর সম্ভ্রমবোধে আঘাত করেছে তাদের মধ্যে সে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে আত্ম-মর্য্যাদা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন মেয়ে হারিয়ে গেছে বহুবার—কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে মালতী। ব্যতিক্রমে তাই মালতীর বৈশিষ্ট্য আমার কাছে সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। আমার এই বার্দ্ধক্যের মুমূর্ষু আলোয় মালতীকে আমি আর নূতন ক'রে বাঁচাতে পারিনা। পারি না মালতীকে গৌরবের আসনে বসিয়ে নব-সৃষ্টির আত্মতুষ্টিতে অবগাহন করতে। তাই কেবলই মনে হচ্ছে অপহৃতা হিন্দুর মেয়ে মালতীর জন্য আমিও সম্ভব পরের জীবনে স্বপ্ন দেখব।

স্বপ্ন দেখার বয়স আমার গেছে। তবুও পরকালের স্বপ্নে মালতী আমার অধিষ্ঠাত্রি দেবী হ'য়ে রইল। কেরোসিন লণ্ঠনের আলোর নীচে মালতীকে দেখে

এসেছি, গ্রামান্তের পরিত্যক্ত কুটীরে মালতীর সংগে কথা ক'য়ে এলুম, অনুভব ক'রে এলুম জীবন্ত মালতী পরের জীবনে আমার প্রথমা প্রিয়া।

রাজপুরে যা'র আশ্রয় মিলল না, সুরাজপুরে সে নূরজাহান। আমরা ওদের বর্ব্বর বল্লেও, ওরা শিল্পীর রক্ত পেয়েছে—সুন্দরীকে ওরা নূরজাহান ডাকে, নূরজাহানের জন্য সাজিয়ে রাখে প্রেমের মস্‌নদ।

লালামিঞা তা'র প্রেমের মস্‌নদে বসিয়েছে নূরজাহানকে। শাজাহান মমতাজের স্বপ্ন দেখেছেন তাজমহলে, লালামিঞা স্বপ্ন দেখছে কুলুঙ্গিরক্ষিত মালতীর পরিত্যক্ত বোরকায়। প্রেমের রাজ্যে শাজাহানের পাশেই লালামিঞাকে কবর দে'য়া হবে। একই শয্যায় দু'জনের হ'বে প্রেমাশ্রু বর্ষণ। জয় হোক লালামিঞার, কিন্তু মৃত্যু হোক মালতীর।

কবি রঘুরাথ চক্রবর্ত্তী স্বপ্ন দেখতে পারে, কিন্তু হিন্দু রঘুনাথ স্বপ্ন দেখে না। সে চায় না মালতী আবার ফিরে আসে। সে কামনা করে মালতীর মৃত্যু। হিন্দু-স্থানের পরাজয়, মালতীর সন্তানের কপালে হ'বে জয়ের টীকা। যুগ যুগ ধরে, আমাদের কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে থাকবে মালতীর সন্তান-সন্ততি। রক্ষা করতে পারিনি বলে আমরা লজ্জা পাইনি—ফিরে পেলাম ব'লে আমাদের লজ্জার সীমা নেই।

সন্ধ্যের সময় থেকেই সুরাজপুরের হাওয়া আজ গরম হ'য়ে উঠল। পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লার আশে পাশে প্রায় দশ সহস্র মুসলমানের জনতা। আরও বিশ তিরিশটা পল্লীগ্রাম থেকে লোক সব ছুটে আসছে। সবাই জানে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লায় আজ মিটিং বসবে। দশ সহস্র মুসলমান জনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। পাকিস্থানের পরেও ওরা শান্ত হয়নি। দু'চার জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি মিঞা, যাচ্ছ কোথায় ?"

"যাচ্ছি মিটিং-এ। জান্ দিতে হ'বে বলেই ডাক পড়েছে।"

কথা শুনবার সময় নেই। স্রোতের জলের মতো, ছুটেছে জনতা।

জান্ দিতে হ'বে বলে এরা কি সব বিদায় নিয়ে এসেছে প্রিয়জনদের কাছ থেকে ? আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি ভেবে যে প্রিয়জনরা এত সহজে এদের বিদায় দেয় কি করে ? কেন জান্ দিতে হবে, তা'ও এরা জানে না। জানবার হয়তো চেষ্টাও করে নি একবার। ধর্ম-জীবনের মৌলবীর চাইতে মহম্মদ উজবেক খাঁর আদেশ আজ বড়।

এদিকে নগেন মণ্ডলের বাড়ীতেও সভা বসেছে। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সবাই আজ উপস্থিত। আশংকার তীব্রতা হেতু, এরা সব পাথরের মতো বাক্‌রহিত হয়েছে।

কথা কেউ সাহস করে বলতে পারছে না, কারণ কেউ নিঃসন্দেহ নয় যে, কথা কেউ আদৌ বলতে পারবে কিনা। অন্দর মহলের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিষের কৌটো হাতে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করে আছে। রান্নাঘরের দরজা খোলাই পড়ে আছে, ভাঁড়ারের চাবী যে কোথায়, কেউ তা' আজ আর সন্ধান রাখে না। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সাধের সংসারটা যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল!

বয়োজ্যেষ্ঠ গগন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, "কই, সেই যুবকের এখনও যে দেখা নেই?"

নগেন মণ্ডল বল্ল, "আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছে, তখন আমাদের কিছুতেই বিপদে ফেলবে না।"

বিনোদবিহারী বল্ল, "আশা ক'রে হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে লাভ কি? অস্ত্রগুলো সব ঠিক ক'রে রাখলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়।"

গগন মণ্ডল বল্ল, "ল্যাঠা চুকে না গিয়ে হয়তো, ল্যাঠা বেধেই যাবে। অস্তরগুলো যদি ওরা দেখেই ফেলে, তবে বিপদের আর সীমা থাকবে না।"

"বিপদটা যে সীমার মধ্যে আছে, সে কথা ভাবছেন কি করে? টুটি চেপে ধরলে, তখন বিচালীর তলা থেকে পিস্তলগুলো আনবে কে শুনি? আমি যাই এখুনই নিয়ে আসি।"

বিনোদবিহারী যাওয়ার জন্য ভংগী করতেই, বয়োজ্যেষ্ঠ গগন মণ্ডল তার হাতটা চেপে ধরে বল্ল, "দোহাই তোর ভাই—এখন যাস নি।" থর-থর ক'রে কাঁপতে থাকে নগেন মণ্ডল। সমস্ত ঘরময় একটা কাঁপুনির দেহ-কম্প হতে লাগল।

শঙ্কর ঠাকুর আজকে গামছাটা কোমরে জড়িয়েছে। পাথরে গড়া শিবলিঙ্গটা সম্ভব আজ আর সংগে নেই। ধুতিটা মালকোঁচার মতো ক'রে, বেশ আঁটো-সাঁটো ভাবে পরেছে আজ। দেখে মনে হয়, পরিচ্ছদের কায়দাটা পলায়নের সময় গতির মুখে কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। শঙ্কর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রলোক কথা দিয়ে গেলেন সংগে করে মৃত্যু-বাণ নিয়ে আসবেন—এ সবই সম্ভব ফাঁকি. তিনি যখন এলেন না, তখন আর কালবিলম্বের দরকার কি? কি ভাই নগেন? চলো, এবার বেরিয়ে পড়ি। মাইল দু'য়েক রাস্তা ছুটতে হবে তো!"

শঙ্কর ঠাকুরের কথায়, কেউ সাড়া দিল না। সবাই কাণ পেতে রয়েছে, কখন এরা আসবে। দূরে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছিল, "আল্লা-হো-আকবর"।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'লো মণ্ডল পাড়ার তপন বাড়ুই। হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, "খুব সম্ভব বাঁচবার আশা আছে।"

"এ্যাঁ—বলো কি? বলেছিলাম না, প্রতিশ্রুতি যখন

সে দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই আসবে।" একটু আশা হয়েছে মনে নগেন মণ্ডলের।

তপন বাড়ুই বল্ল, "আসবে আবার কে? সেই ছোঁড়াটার কথা বলছ তো? যত সব শহরের কলেজে পড়া ফক্কড়।"

নগেন মণ্ডল বল্ল, "এসব বলছ কি তুমি?"

"ভাই বলছি ঠিক কথাই। এসব পাঠান ফৌজের সংগে তুক্-তাক্ চলে না।"

"তবে যে বল্লে, বাঁচবার আশা আছে?" প্রশ্ন করল নগেন মণ্ডল।

"হাঁ ভাই ঠিকই বলেছি। কায়েস্থপাড়ার পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম ওরা সব ছুটেছে রাজপুরের দিকে। আরে ভাই সে কী মশাল! সমস্ত আকাশটা একেবারে রাঙা হয়ে গেছে। খুব বেঁচে গেছি আমরা।" তপন বাড়ুই দম নিচ্ছিল। জলে ডুবে মরতে-মরতে ঈশ্বরের দয়ায় হাতের কাছে একটা কুটো পাওয়া গেল।

পাকিস্থানী ফৌজ গেছে রাজপুরের দিকে।

বয়োজ্যেষ্ঠ গগন মণ্ডল বল্ল, "ওহে নগেন, সময় থাকতে ও-সব অস্ত্রগুলো এ'বার ঐ পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে এস। বলা যায় না, কখন আবার ওরা দেখে ফেলে। ও-আপদ বিদেয় করো এ'বার।"

বিনোদবিহারী বল্ল, "জাল ফেলে পুকুর থেকে যদি টেনে তুলে নিয়ে আসে?"

"তাইতো! জাল ফেলা তো অসম্ভব নয়! তবে এক কাজ করো, ও জিনিষগুলো মাটীর নীচেই পুতে ফেল। ছোঁড়াটা আমাদের কী বিপদেই না ফেলে গেছে।" গগন মণ্ডলের বিপদ এখনো কাটেনি। ঘরে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—যোয়ান বয়েস, বিপদ অত সহজে কাটার কথা নয়।

এরপর সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে—অমাবস্থার আকাশ, সবাই দেখতে পেল, শুধু রং—আর লাল রং। যাক্ বাঁচা গেছে—অন্ততঃ আজকের রাত্তিরে আর ফিরবে না ওরা এ'দিকে। সুতরাং রান্না-বান্নার কাজগুলো মেয়েরা করেই ফেলুক। নগেন মণ্ডল ভেতরের দিকে চেয়ে মেয়েদের উদ্দেশ্য ক'রে বল্ল, "একটা ডাল ভাতের ব্যবস্থা করলেই হয়ে যা'বে।"

বিনোদবিহারী বল্ল, "দাদা, সংগে দু'চারখানা ফুলুরী কিংবা বেগুনীর ব্যবস্থা থাকলে, যা'কে বলে গিয়ে সোনায় সোহাগা। ব্যাটারা তো আজ সাহস করে গেছে হিন্দুস্থানের দিকে। মার খেয়ে আবার তাড়াতাড়ি এ'দিকে ফিরে না আসে।"

"তা' হলে"—অন্দরের দিকে চেয়ে গগন মণ্ডল বল্ল, "তাড়াতাড়ি একটা খিঁচুড়ি পাকিয়ে ফেল।"

বিনোদবিহারী বল্ল, "সংগে ত্ব'চারখানা ফুলুরী কিংবা পেঁয়াজী হ'লে ভালই হবে। আরে দাদা খিঁচুড়ি খেয়েই মরতে যদি হয়, তবে সেই সংগে ত্ব'চারখানা বেশ টাট্‌কা টাট্‌কা ফুলুরী খেয়ে মরতে আপত্তি কি ?"

বিস্ময়বোধ করে নগেন মণ্ডল।

"না আপত্তি আর কি ! মরতে যদি হয়, তবে বিষ খেয়েই মর আর খিঁচুড়ি খেয়েই মর, আমি কিছুতেই আপত্তি করব না।"

দূরে শোনা গেল, মৃতের আর্ত্তনাদ।

* * *

আমার মনেও আজ শান্তি নেই। পাকিস্থানী ফৌজ আজ ছুটেছে মালতীকে উদ্ধার করবার জন্য। তুর্জ্জয় সাহস আর অপরিমিত আকাজ্ক্ষা। আমি জানি মালতী আসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—শুধু আহ্বানের প্রতীক্ষায় বসে ছিল মালতী। কিন্তু সেই যুবক ? সে আজ মালতীকে ছাড়বে কেন ? মালতীর জন্য হয়তো ততো মমতা নেই—কিন্তু মালতীকে কেন্দ্র ক'রে রয়েছে সমগ্র হিন্দু-জাতির মান-সম্মানের কথা। সেই মান-সম্মান বাঁচাবার জন্য খুব সম্ভব যুবকটি আজ একক যোদ্ধা। সংগ্রাম সে করবে, হয়তো মরবেও সে এই সংগ্রামে। কিন্তু ওর মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মালতীকে

থাকতে হ'বে রাজপুরে, মালতী পালিয়ে গেলে, যুবকের নৈতিক শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। জীবন দানে গৌরব আছে, নীতি দানে কলঙ্ক। আমি এখানে বসে, দূরান্তের ঐ ক্লীব আর্ত্তনাদের মধ্যে, যুবকের কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার সংখ্যায় যুবকের কি স্থান হ'বে না? আমি বিশ্বাস করি, মালতী ওকে সেই সুযোগ দেবে। মালতী ওকে নিরাশ করবে না। জহর ব্রতের আত্মহত্যা-মার্কা মেয়ে তো মালতী নয়।

* * *

সন্ধ্যার প্রাক্কালে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লায় ছুটে এল 'আল্লা-হো-আকবরের' অনুগামী অসংখ্য বিশ্বাসী ভৃত্যের দল। হাতের কাছে যা' পেয়েছে, তাই নিয়ে ওরা ছুটে এসেছে। অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা না থাকলেও, ওরা জানে যুদ্ধ করতে হ'লে অস্ত্র চাই।

কেল্লার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মহম্মদ উজবেক খাঁ হুঙ্কার দিলেন, "আমাদের স্বাধীন পাকিস্থানকে আঘাত করবে ব'লে রাজপুরের ঘরে ঘরে সবাই অস্ত্রে শান্ দিচ্ছে। যে-পাকিস্থান আমরা লড়ে আদায় করেছি, তার প্রতি আঘাতের যারা স্পর্দ্ধা রাখে, তাদের আজ বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরা মুসলমান—ইস্‌লামে কাপুরুষের স্থান নেই। তোমরা—"

চারদিকে জনতার পরিধি পরিমাপ ক'রে মহম্মদ উজবেক খাঁ বল্লেন, "ভুলে যেও না যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ জয় করবার জন্য, যেন কেউ এসে আমায় না বলে যে তোমরা রাজপুরের যুদ্ধে হেরে এসেছ।"

জনতা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। হাতের অস্ত্র তখনও চালাতে পারছে না, কণ্ঠস্বরে শক্তির তুফান তুলে চীৎকার ক'রে উঠল, "পাকিস্থান জিন্দাবাদ।"

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা ছিল সত্য, কিন্তু সত্য-যুগীয় ক্লীবতা ছিল না। জপ্ তপ্ করতে করতে গলাটা তীক্ষ্ণ তরবারির নীচে এগিয়ে দে'য়ার লোক এরা নয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদের প্রচুর ব্যুৎপত্তি ও গবেষণা না থাকলেও, এরা আল্লার দয়ায় হজরত মহম্মদের বাণী বুঝতে পারে।

উজবেক খাঁ বসির মিঞাকে ডেকে বল্লেন, "এবার বেরিয়ে পড়্। সীমান্তের পরেই মাঠ, মাঠের পরেই একটা একচালা টিনের ঘর, সেই টিনের ঘরেই থাকে নূরজাহান। ওরা যেন পালিয়ে যাওয়ার সময় না পায়। নদীর ধারে খেয়াঘাটের নৌকাটা আগেই দখল ক'রে ফেলবি। দলের সবাই যখন লড়াই করতে থাকবে, তুই তখন নূরজাহানকে নিয়ে সীমান্তের দিকে সরে আসবি। লড়াইতে যদি হার হয়, তবে সরম নেই—কিন্তু নূরজাহানকে না নিয়ে এলে সরমের সীমা থাকবে না।

দলের অন্য সবাইকে লুটের সোনা বিলিয়ে দিস। লালা মিঞা রইল এই পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেল্লায়। আমিও এইখানে বসে রইলাম নূরজাহানের অপেক্ষায়। বল্, আল্লা-হো-আকবর, পাকিস্থান জিন্দাবাদ।" মশাল আর অস্ত্র হাতে জনতা ছুটল রাজপুরের দিকে।

সবাই চলে যাওয়ার পর হঠাৎ এই কেল্লার চারপাশে কেমন একটা মারাত্মক নৈঃশব্দ নেমে এল। লালামিঞা পিস্তল হাতে, কেল্লার সামনে পায়চারি করছে। রাজপুরের যুদ্ধে লালামিঞাকে যেতে দিল না মহম্মদ উজবেক খাঁ। লালামিঞার পাঠান রক্ত কাজে লাগল না রাজপুরের সমর-ক্ষেত্রে।

মহম্মদ উজবেক খাঁ কেল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদূর গেল ওরা ?"

"প্রায় ঐ একচালা টিনের ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে।" জবাব দেয় লালামিঞা।

উজবেক খাঁ বল্লেন, "টিনের ঘরের দূরত্বটা তোমার স্মরণ থাকে ভাল। ক'বার যাওয়া-আসা করেছ মিঞা ?"

স্তিমিত আলোকে লালামিঞার মুখের অংশ থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না তার উপস্থিত মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। বুশ্-সার্ট আর লুঙ্গীর মিলন-মাধুর্য্যে শারীরিক পরিবর্ত্তন তা'র পূর্ব্বের মতই স্পষ্ট, কিন্তু নূরজাহান উদ্ধারের লোভনীয় আশার মুলোচ্ছেদ করলেন

মহম্মদ উজবেক খাঁ। নূরজাহান উদ্ধারের জন্য তার পিস্তল আজ ক্ষুধিত হয়ে উঠেছিল, ব্যর্থ হ'লো ক্ষুধিত পিস্তল, ব্যর্থ হ'লো লালামিঞা।

উজবেক খাঁ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "বসিরুদ্দীনের বিবির জন্য তোমার এত দরদ কেন মিঞা?"

"জবাবটা কি জেলার বড়কর্ত্তার কাণে শুনতে ভাল লাগবে?"

"লাগবে, লাগবে। তুমি বল তোমার প্রেম-প্রণয়ের কাহিনী। ওরা যতক্ষণ না নূরজাহানকে নিয়ে ফিরে আসে, ততক্ষণ তোমার প্রণয়কাহিনী শুনি। মেয়েটা বুঝি দেখতে খুব ভাল ছিল?"

লালামিঞা বল্ল, "হুজুর প্রণয়কাহিনী শুনবেন ব'লে অত ছটফট করছেন কেন।"

উজবেক খাঁ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন এক ধাপ। বল্লেন, "বড় মিঞার মেজাজ দেখছি খুবই গরম হ'য়ে আছে আজ।"

"আজ থেকে নয় হুজুর" জবাব দেয় লালামিঞা।

"কবে থেকে শুনি?" প্রশ্ন করলেন উজবেক খাঁ।

"যেদিন থেকে নূরজাহান পালিয়ে গেল।"

মহম্মদ উজবেক খাঁ পকেট থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আরও দু' ধাপ নীচে নেমে এলেন। লালা মিঞা কেল্লার একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

"কি মিঞা যাচ্ছ কোথায়? এদিকে এস, তোমার প্রণয়ের গল্পটা একটু শুনি।" অনুরোধ করেন মহম্মদ উজবেক খাঁ।

"বড়কর্ত্তার গল্প শোনার সাধ হ'য়েছে বুঝি? সাধ থাকা ভাল, কিন্তু সাহস করবেন না।" লালামিঞার কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও স্পষ্ট।

মহম্মদ উজবেক খাঁ পশ্চিমের আকাশের দিকে মুহূর্ত্ত কয়েক চেয়ে রইলেন। মনে মনে সম্ভব অনুমান করলেন যে এতক্ষণে নিশ্চয়ই নূরজাহানের টিনের ঘর পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে। মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম ক'রে বসিরুদ্দীন নিয়ে আসছে নূরজাহানকে।

তিনি পুনরায় লালামিঞাকে বল্লেন, "আমার সাহসের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে না বড় মিঞা? কলজের খুন দিয়ে পাকিস্থান তৈরী করেছি—আর সেই খুনে ভেজা পাকিস্থানের বুকে দাঁড়িয়ে আমার উপর হুকুম চালাচ্ছ? সাহসের বাহাদুরী আছে বটে তোমার। সেদিন রাত্তিরে আমার ঘরে হাতের পিস্তল টেনে নিয়ে গেলে, নইলে—"। কথাটা অসমাপ্ত রেখে উজবেক খাঁ নেমে এলেন নীচে। পা'য়ে তাঁর বাতের ব্যথা সুরু হ'য়েছে, তাই হাতের পিস্তল সজোরে তুলে ধরলেন উপর দিকে। চকিতে চালিয়ে দিলেন গুলি। একটু চুপ ক'রে রইলেন, যেন কাণ পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন, লালামিঞার দেহটা লুটিয়ে পড়ে

কি না মাটিতে। লালামিঞা কেল্লার আড়াল থেকে বল্ল, "এবার আমার জবাবটা শুনুন বড় মিঞা।" লালা মিঞার প্রথম গুলিতে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন উজবেক খাঁ। তারপর নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে আরও একবার গুলি ছুঁড়ল।

নূরজাহানের স্বপ্ন পাকিস্থান সীমান্তে মিলিয়ে গেল—দেহটা পড়ে রইল কেল্লা-সংলগ্ন লালামিঞার জমিতে। এই জমির উপর দিয়েই পাকিস্থান সীমান্তের নর্দ্দমাটা চলে গেছে সেই উদয়দীঘির খাল পর্য্যন্ত।

লালামিঞা চেয়ে দেখল, পশ্চিমের আকাশটা একেবারে লাল—মশালের আলোতে।

* * *

লণ্ঠনের আলোয় বসে বসে লিখছিলুম। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি। জানলা খোলা আছে—সেই জানলা দিয়ে শুনতে পাচ্ছি, রাজপুরের আর্ত্তনাদ। এমন সময় দরজায় কে আঘাত করে ডাকল, "এটা না রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী?" গত তিন মাসের মধ্যে আমায় কেউ বাইরে থেকে ডাকেনি।

দরজা খুলে সামনে চেয়ে দেখি, মালতী।

"এস ভেতরে এস। পালিয়ে এলে বুঝি?" জিজ্ঞাসা করলুম।

"বলতে পারেন পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার আসবার আগে কারো কাছে আদেশ নেয়ার তো দরকার ছিল না দাদু। সত্যিই—এতো পালিয়ে আসা নয়।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন, সেই যুবকের আদেশ নেয়ার কি দরকার বোধ কর নি মালতী?"

"কপাল আমার! সে কি আর আছে নাকি রাজপুরে?"

আশংকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন, কি হয়েছে তার?"

হাসির মতো ভংগী ক'রে মালতী জবাব দেয়, "দু'দিন আগেই কলকাতার পুলিশ এসে তা'কে ধরে নিয়ে গেছে দাদু। যে অর্থ আর আয়াস দিয়ে পুকুরের তলায় একটা অস্ত্রাগার তৈরী করেছিল সে, সেটাও পুলিশের হাত এড়ায় নি। যুবকের সংগে গাঁয়ের আরও পাঁচ ছ'টি ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।"

হতাশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "বসিরুদ্দীনের দলের সংগে এখন লড়বে কে?"

"এর উত্তর আমি কি ক'রে দেব দাদু? ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর উত্তরটা নিশ্চয়ই লেখা আছে। তিন্‌শো চৌষট্টি দিন যারা শক্তিহীন, তারা বছরে একদিন জাঁক ক'রে শক্তির পূজায় পাঁঠা বলি দেয়। দাদু আজকে যে কালীপূজা।"

ভুলে গিয়েছিলাম সে কথা। প্রতি মুহূর্তে যাদের জীবন হারাবার আশংকা, তারা পঞ্জিকা খুঁজে কালী পূজোর দিন-ক্ষণ দেখবে কি করে?

একটু চুপ ক'রে থেকে, মালতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যখন হলোই না, তখন কি দু'টো রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই দাদু?"

বল্লুম, "সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সাম্প্রদায়িক ইট-শুরকী দিয়ে রাষ্ট্রের প্রাসাদ তৈরীর যারা স্বপ্ন দেখছেন, তাদের প্রাসাদের ক্ষণ-স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এক রকম নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সমস্যা সেখানে নয়। দুর্ব্বলের বিপদ প্রতি পদক্ষেপে। থানেশ্বরের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা। তারপরে আমরা ভারতবর্ষে একাধিক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করেছি—আর সেই থেকে আমাদের দুর্ব্বলতায়, প্রতিপক্ষের শক্তি শুধু বেড়েই চলেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই, বলীয়ানের বৃদ্ধি আর দুর্ব্বলের ক্ষয়। কিন্তু, আমাদের শাক্তিশালী হওয়ার মূলে পাকিস্থান আক্রমণের ইঙ্গিত থাকবে না। আমাদের বাঁচবার জন্যই আমাদের শক্তিশালী হ'তে হ'বে। প্রতি-পক্ষের ধারণায় হিন্দুস্থান যেদিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সেদিন থেকেই রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু ঘটবে।"

"কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমায় সোজা ক'রে বুঝিয়ে দিন যে দু'টো রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব হ'বে কি না।"

"বন্ধুত্ব হতেই হবে। নইলে, কোনটাই যে টিকবে না।"

"সে তো ভবিষ্যৎবাণী দাদু। কি কি কারণে বন্ধুত্ব হবে কিংবা হওয়া সম্ভব, সেই কথাটাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমরা যেদিন কাপুরুষতার মিথ্যে আবরণটাকে সদর রাস্তায় ছিঁড়ে টুক্‌রো করে ফেলে দিয়ে সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠব, সেদিন নিকটতম প্রতিবেশীর সংগে হ'বে সখ্যতা এমন কি হৃদ্যতা হওয়াও অসম্ভব নয়। কাপুরুষতার শেকড় আমাদের জীবনের সংগে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে খুব কঠিন ও গভীর অস্ত্রোপচার ব্যতীত, মুক্তির আশা কই মা।"

মালতী বল্ল, "সে তো ঠিক কথা দাদু। বৎসরাধিক-কাল পাকিস্থানে বসবাস করবার পর আমার কেবলই মনে হ'য়েছে যে, আমাদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের বহু বিজ্ঞাপিত কীর্ত্তিগুলো দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। পুকুরের পচা জলে স্নান ক'রে কেবলই মনে করছি যে অমৃত-সাগরের অবগাহন তৃপ্তি এল। কিন্তু দাদু, যে-দেশে জাত বিভাগের উপরে ধর্মের গুরুত্ব

নির্ভর করে, সে দেশের লোক শক্তি সংগ্রহ করবে কেমন ক'রে ?"

বল্লুম, "জাত-বিভাগ তুলে দেওয়া যায় আইনের জোরে। কিন্তু জাতি সৃষ্টিতে ধর্মের প্রয়োজন অপরিহার্য্য মা। হিন্দুর প্রাচীনতায় দুর্ব্বল মানুষের আকর্ষণ অপরিসীম। তাই ব'লে ভবিষ্যতের কল্পনায় হিন্দুরা সুস্থ সবল হ'য়ে উঠবে না, তেমন বিশ্বাস আমি হারাই নি।"

"আচ্ছা দাদু, তুমি সম্ভব তোমার জীবনী লিখছ। একটি অপহৃতা হিন্দু রমণীর নিকটতম সান্নিধ্যের এমন একটি অশুভ মুহূর্ত্ত তোমার জীবনীতে স্থান পাবে না জানি। কিন্তু মনে করো আজকে যার জন্য সীমান্তের ওপারে হাজার জীবনের অনর্থক পরিসমাপ্তি ঘটছে, যার জন্য আগামী কল্যের খবরের কাগজে অনেক কিছু লেখা হবে, তাকে তুমি খানিকটা স্থান দিও তোমার জীবনীতে। ইতিহাসের পাতায় যারা বাঁচবে না, তারা কেউ একজন তোমার জীবনীতে বাঁচুক, তেমন একটা অনুরোধ তোমার কাছে রইল দাদু।"

হাসি পেল মালতীর কথা শুনে।

বল্লুম, "পাকিস্থান পত্রে, নোয়াখালির মেয়ে মালতীই যে হিরোইন !"

"বল কি দাদু ? হিরোটি কে ?"

"এই তো বিপদে ফেল্লে। বই যে প্রায় শেষ হ'য়ে এল, এখনো যে হিরো আমার আসেনি মা।"

"আশাকরি, আমার কলকাতার সহুরে স্বামীকে 'হিরো' বলে অপমান করবেন না। দাদু, তোমার অন্দরে চানের জায়গাটা কোন্ দিকে। মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে আসি।"

"বেশ ত মা, যাও। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে এস, এর মধ্যেই দেখি চেষ্টা ক'রে 'হিরো'টিকে খুঁজে বার করতে পারি কিনা।"

মালতী গেল আমার অন্দরমহলে।

* * * *

"দাদাঠাকুর বাড়ী আছেন না কি?"

"কে রে, ভেতরে আয়।"

ভিতরে এল লালামিঞা। বিস্মিত হ'য়ে গেছি। যুদ্ধের পোষাক নেই, হাতে পিস্তল নেই, যেন সেই অবিভক্ত বাংলার আমাদের পুরোনো লালামিঞা! রাজপুর বিজয়-বাহিনীতে লালামিঞা তা হ'লে যোগ দেয়নি। আর কেউ না জানুক, ঈশ্বরের আদালতে ইতিহাস সাক্ষী দেবে যে দুর্ব্বলকে হত্যা ক'রে পাকিস্থানের জন্য জয়ের মালা সে কিনে আনেনি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কি রে, কি মনে করে?"

"এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি দাদাঠাকুর। আর ভাল লাগছে না।"

আমি লক্ষ্য করলুম, লালামিঞার চোখে স্বপ্নের কুজ্ঝটিকা, শিল্পীর বেদনাবিধুর আন্তরিকতা, পূর্ব্বপাকিস্থান কেল্লায় যেন লালামিঞাকে মানায় না।

"এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে হাঁপিয়ে উঠলি লালা? উজবেক খাঁ তোকে যেতে দিল? কিংবা যেতে দেবে কেন? তাঁ'র হুকুম তোকে মানতেই হ'বে।"

"হ্যাঁ দাদাঠাকুর, খোদার হুকুম আমি মেনেছি। তাকে আমি গুলি ক'রে মেরে ফেলেছি।" একটু থেমে সে বল্ল, "নূরজাহানের উপর লোভ তো কম ছিল না। আমি এদেশ থেকে চলে যাচ্ছি। ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছি, সে যেন মনেও করবেন না। কবরের ভয় লালামিঞার নেই। আমি জানি খোদার দরবারে আমার কোন অপরাধ হয়নি। তবু যাচ্ছি। অন্ধকার রাত্রে সীমান্ত পাহারা দিয়েছি—ঘুম আসেনি চোখে দাদাঠাকুর। চেয়ে ছিলাম রাজপুরের দিকে—ভুল ক'রে নূরজাহান্ যদি ফিরে আসে পাকিস্থানে! কিন্তু পাকিস্থান যারা একবার ছাড়ে, তা'রা কি আর ফিরে আসে? আর আসবেই বা কেন দাদাঠাকুর? মুখ্যু-লোকের হাতে কেতাব থাকলেই তো আর বিদ্বান হয় না। মুখ্যুরও তাতে পেরেশান্ আর কেতাবেরই বা কদর কোথায়!"

আমি অনুভব করলুম, লালামিঞা যদি শাজাহান হ'তো, তবে নূরজাহানের জন্য দ্বিতীয় তাজমহলের সৃষ্টি হ'তো পাকিস্থান সীমান্তে।

পাকিস্থান পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এসে উপস্থিত হয়েছে লালামিঞা। রাজপুরের আর্ত্তনাদ তখনো কানে আসছে —হাজার বছরের কাপুরুষতাগুলো যেন আমার কলমের ডগায় অক্ষর-আকারে গড়িয়ে পড়তে চায় অসংখ্য শবদেহের মতো। ভাবছি শেষ পৃষ্ঠায়, সেই শবদেহ গুলোকে সংগ্রহ ক'রে আনব, না আমার লেখনী চাতুর্য্যে লালামিঞার জন্য একটা বিদায় অভিনন্দন লিখব। তবে কি লালা মিঞাই আমার 'হিরো'? লালামিঞা সম্ভব সন্দেহের অবকাশ রাখতে দেবে না।

সে বল্লে, "দাদাঠাকুর, যাচ্ছি চলে, কিন্তু বোঝা তো বইতে পারব না। নূরজাহান ফেলে গিয়েছিল তাঁর বোরকা। আমার ঘরের কুলঙ্গিতে একে ফেলে রেখে যাব,—এ যেন মনে ধরছে না। সে যদি আবার কখনো কোনদিন এদিকে আসে তবে—"

মালতী এমন সময় বাইরে এল।

বোরকা হাতে লালামিঞা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। এই স্তব্ধতার মধ্যেই র'য়েছে শিল্পীর স্বপ্ন—শিল্পীর অবচেতন মনের অন্তহীন নিবেদন রূপ পরিগ্রহ করেছে এই স্তব্ধতার মধ্যে। মানব ইতিহাসে উজবেক খাঁ-র দর্শন

সহজ লভ্য, কিন্তু লালামিঞারা সংখ্যায় কম ব'লেই, তা'দের দর্শন মেলে দৈবাৎ।

আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম যেন খণ্ডিত বাংলার সীমান্তের চিহ্নটা ক্রমশই বিস্মৃতির তমিস্রায় বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও যেন সেই বিভক্ত রেখাটিকে স্পষ্টতর করা যাচ্ছে না। ধর্ম ও সমাজের অনুশাসন-অবগুণ্ঠন ধূমায়িত আকাশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মানুষের শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে আমি দেখতে পেলাম অবগুণ্ঠনের আর কোন অস্পষ্টতাই নেই। সেই ভাল!—আঘাত ও লাঞ্ছনার পরিবর্ত্তে জীবনের সৌন্দর্য্যে আমাদের নূতন ক'রে ধর্মের দীক্ষা হোক। আঘাত ও প্রতিঘাতে যে-সমস্যার সমাধান হ'লো না, প্রেম ও প্রিয়ভাষণের মধুরতায় সে সমস্যার যদি আংশিক সমাধান হয়, তবেই ভাল।

কিন্তু লালামিঞা সম্ভব অতটা বুঝতে পারে নি। সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় যাচ্ছিস? সত্যিই কি তুই সুরাজপুরে থাকবি না লালা?"

লালামিঞা জবাব দিল, "কেমন ক'রে সুরাজপুর ছেড়ে যা'ব দাদাঠাকুর? রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরুদ্ধে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে, তবে সে অপরাধের শাস্তি এড়িয়ে-পালিয়ে যেতে তো পারি না।"

"অপরাধ কি হয়েছে তোর লালা ?"

"খুনের অপরাধের জন্য রাষ্ট্রের আইন আমায় ক্ষমা করবে কেন দাদাঠাকুব ? আব ধর্মের বিরুদ্ধে যে অপরাধ—"

কথাটা অসমাপ্ত রেখে, লালামিঞা হাতের 'বোরকা' মাটিতে নামিয়ে রাখল। তার স্বপ্নের নূরজাহান স্বপ্নেই রইল।

তারপর আমার পাকিস্থানের পত্রের শেষ ছত্রের উপরে যবনিকা টেনে দিয়ে লালামিঞা ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।